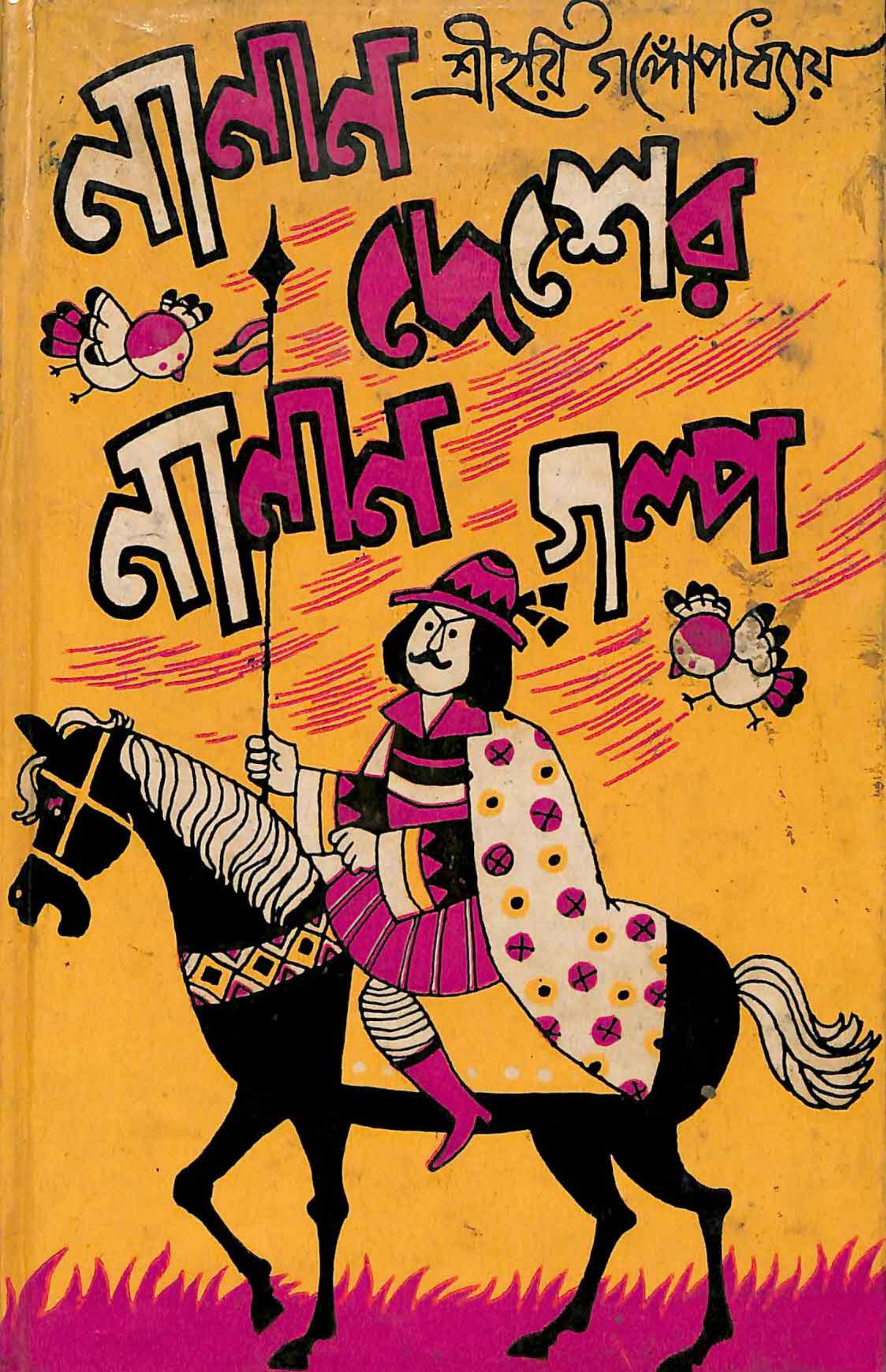

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
নানান দেশের নানান গল্প


শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
দেশের
গল্প

নানান দেশের নানান গল্প

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত : ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : : কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ
১৩৯০

টা. ১০·০০

প্রচ্ছদ ও
অলংকরণ
দেবাশীষ দেব

প্রকাশণ : কণকপ্রভা বসু
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রণ : তাপসী প্রিন্টার্স
লীলা ঘোষ
৬ শিবু বিশ্বাস-লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

রূপকথার রাজা

শিশু সাহিত্য সম্রাট

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এর

স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

স্বামী সূর্য

কোরিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর হল 'ইয়ুং ইল'। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ঐ জায়গাটির নাম ছিল সিল্লা। প্রায় দু'হাজার বছর আগে সিল্লার অষ্টম রাজা আদালা নিসাগম-এর রাজত্বকালে ইয়োনোরাং নামে এক জেলে এবং তার স্ত্রী সোয়েনিও সিল্লার পূর্ব দিকে বসবাস করত। বেশ আনন্দেই তাদের দিন কাটত। সকলের সঙ্গেই মিলেমিশে হাসিখুশি হয়ে তারা থাকত। প্রতিবেশীরা তাদের বলত 'সূর্য' ও 'চন্দ্র' এবং তাদের খুব ভালবাসত। ইয়োনোরাং চাষবাসের কাজ খুব ভাল করতে পারত এবং তার স্ত্রী খুব সুন্দর তাঁত বুনতে পারত। তারা প্রতিবেশীদের চাষবাসের কাজ এবং তাঁত বোনার কাজ শিখিয়ে দিত। ঐ জায়গায় তাদের পল্লীতে একটি সুন্দর আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছিল। ঐ হাসিখুশি দম্পতিটি যতদিন সেখানে বাস করত, ততদিন আকাশের সূর্যের কিরণ ছিল বেশ উজ্জ্বল, বাতাস ছিল আনন্দদায়ক, বৃষ্টি ছিল মধুর। জমিতে প্রচুর ফসলও ফলত। তাই সারা বছরই সকলে বেশ আনন্দে দিন যাপন করত।

একবার বসন্তকালে একদিন বিকালে ইয়োনোরাং সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোল। সমুদ্র তখন বেশ শান্ত ছিল। সমুদ্রের ঢেউগুলির ওপর উজ্জ্বল সূর্যের আলো পড়ে চিক্‌মিক্ করছিল। মাছ ধরে জেলেরা অনেকে সমুদ্রের তীরে ফিরে আসছিল। হঠাৎ কালো মেঘে সূর্য

ঢাকা পড়ল, চারদিক অন্ধকার হয়ে এল এবং সমুদ্রের ওপর ঝড়ের গর্জন সুরু হল। প্রকৃতিতে আচম্‌কা একটা ওলট-পালট হতে লাগল। ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউগুলিও বিরাট আকার ধারণ করে ভীষণ গর্জন করে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল। ইয়োনোরাং-এর ছোট নৌকাটি সেই ঢেউ-এর তোলপাড়ে একটি খেলনার মত দুলতে দুলতে শেষকালে উল্টে গেল এবং ডুবে গেল। ইয়োনোরাং পড়ল বিপদে। সে ঐ ঢেউগুলির সঙ্গে সব শক্তি দিয়ে লড়াই করতে করতে সাঁতার কেটে সমুদ্রের তীরের দিকে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঢেউগুলি যেন বিরাটাকার সাদা ঘোড়ার মত পা ছুঁড়তে লাগল এবং ঘন কাল মেঘে চারদিকে অন্ধকার ঘিরে এল। সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলি একের পর এক তাকে সজোরে আঘাত করছিল। হতভাগ্য ইয়োনোরাং শেষ পর্যন্ত আর না পেরে হাত পা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল—'সোয়েনিও! আমি মারা যাচ্ছি।'

ঠিক সেই সময় সমুদ্রের মাঝখান থেকে পাহাড়ের মত বিরাট একটি শিলা ভেসে উঠল এবং নৌকোর মত ঐ শিলাটি ভাসতে ভাসতে ইয়োনোরাং-এর কাছাকাছি চলে এল। সে ওইটি দেখতে পেয়েই উন্মত্ত আনন্দে কোনরকমে তার একটি ধারে লাফিয়ে উঠে পড়ল। শিলাটি তারপর ঘন নীল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে পূর্বদিকে এগিয়ে চলল। এতক্ষণ ইয়োনোরাং ভয়েই অস্থির হয়ে ছিল; এবার একটু নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে বাড়ীর কথা ভাবতে পারল। তার মনে পড়ল যে এতক্ষণে তার স্ত্রী সোয়েনিও রাত্রির আহার তৈরী করে গরম খাবার নিয়ে তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এই কথা মনে হতেই সে পাগলের মত তার স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল; কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সমুদ্রের মাঝখানে ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে কে তাকে সাড়া দেবে! ঢেউ-এর গর্জনে আর ঝড়ের

ঝাপটায় তার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে তার কানেই ফিরে এল। সে দেখতে পাচ্ছিল অনেকদূরে সমুদ্রের উপকূলে মাছ ধরার আলোগুলি টিমটিম করছে ; কিন্তু সে ত ভেসে চলেছে বিপরীত দিকে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের মধ্যে দূরে সমুদ্র উপকূলের যে দিকটায় তার বাড়ী সেই দিকের দৃশ্যটি ক্রমে অদৃশ্য হয়ে এল। তখন তার চোখ ছুটি জলে ভরে গেল। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত ইয়োনোরাং কিছুক্ষণ পরেই শিলার ওপরে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই বিরাট শিলা সারা রাত ধরে ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভেসেই চলল।

পরের দিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে দেখল দিগন্তে লাল সূর্য উঠেছে এবং সমুদ্রের জলে সূর্যের লাল প্রতিবিম্ব পড়ে জলের অনেকটা অংশ লাল দেখাচ্ছে। তার আশে পাশে অদ্ভুত পোষাকপরা কিছু জেলে সে দেখতে পেল। সে শুনতে পেল তারা কি রকম অদ্ভুত ভাষায় তাকে কি সব বলছে। কিন্তু সে যখন তাদের অদ্ভুত দ্বীপে গিয়ে উঠল তখন তাকে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ঐ জেলেরা তাকে পরবার জন্য নতুন কাপড় দিল এবং ভাল খাবার খেতে দিল। ওদের মধ্যে প্রধান একজন হাত নেড়ে নেড়ে তাকে কি সব বলল, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারল না। লোকটিকে দেখে ওর মনে হল যে সে জেলেদের মোড়ল গোছের কেউ হবে। তার কথা না বুঝতে পেরে আকারে ইঙ্গিতে সে তাদের বলল কাগজ ও তুলি এনে দেবার জন্যে যাতে সে কিছু লিখে দিতে পারে। কাগজ ও তুলি আনা হলে সে তাতে লিখে দিল—আমি সিল্লার একজন জেলে। ঝড় তুফানে কোনরকমে একটি শিলায় ভেসে আমি এখানে এসেছি। বাড়ীতে আমার স্ত্রী আছে। আমাকে তোমরা আমার বাড়ীতে পৌঁছে দাও।

ইয়োনোরাং-এর সুন্দর হাতের লেখা দেখে এবং তার আচার ব্যবহারে খুশী হয়ে জেলেদের মোড়ল মশাই তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং অনেকবার তার সামনে মাথা নীচু করে তাকে নমস্কার জানিয়ে অনুরোধ করল তার শিক্ষক হবার জন্য। তাদের আতিথেয়তায়

খুশি হয়ে ইয়োনোরাং ঐ অদ্ভুত লোকজন, অদ্ভুত ভাষা ও অদ্ভুত রীতি নীতির দ্বীপে বাস করতে রাজী হল এবং ওখানেই রয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বীপের লোকেরা তাকে মহান গুরু বলতে সুরু করল এবং তাকে খুব আদর আপ্যায়ন করতে লাগল।

এদিকে সোয়েনিও তার স্বামীর জন্য অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন কাটাতে লাগল। সে মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে চলে যেত এবং 'ইয়োনোরাং, ইয়োনোরাং' বলে চিৎকার করে ডাকত। একদিন সমুদ্রের ধারে ঘুরতে ঘুরতে সে একটা বিরাট শিলা দেখতে পেল এবং তার ওপর একজোড়া খড়ের জুতা দেখতে পেল। জুতা জোড়া দেখেই সে চিনতে পারল—এ ত তার স্বামীর জুতা। সে লাফ দিয়ে ঐ শিলার উপর উঠে আনন্দের সঙ্গে জুতা জোড়া ভাল করে দেখে চারদিকে তার স্বামীকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ শিলাটি একটু নড়ে উঠল এবং তার পরই পূর্বদিকে ভেসে চলতে লাগল। এইভাবে সোয়েনিও তার স্বামী যে দ্বীপে গিয়ে উঠেছে, সেই দ্বীপে পৌঁছে গেল।

দ্বীপের লোকেরা তাকে দেখতে পেয়ে তাদের মোড়লের কাছে নিয়ে গেল। মোড়ল তার সৌন্দর্য ও শান্ত স্বভাব দেখে বলল—'এ ত চাঁদ। এর উপযুক্ত হল সূর্য—আমাদের গুরু।' এই বলে তারা তাকে ইয়োনোরাং-এর কাছে নিয়ে এল। এইভাবে ঐ অদ্ভুত দ্বীপে তারা আবার পরস্পর মিলিত হল।

এই ঘটনার পর থেকে সিল্লা রাজত্বে আর সূর্যকিরণ ও চন্দ্রকিরণ দেখা যেত না। আকাশ সবসময় ঘোলাটে মত হয়ে থাকত। আবহাওয়া বিরূপ হয়ে গেল, ক্ষেতের শস্য নষ্ট হয়ে গেল এবং রাজ্যের লোকেরা ক্ষুধায় এবং শীতে কাঁদতে লাগল। রাজা আদালা-নিসাগম রাজসভার পারিষদবর্গ সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র উপকূলের পূর্বদিকে গেলেন এবং স্বর্গের দেবতার পূজা দিলেন। কিন্তু তাতে প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হল না। রাজা এতে খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

তিনি তাঁর পরিষদের প্রকৃতিবিষয়ক পারিষদকে ডেকে পাঠালেন এবং সূর্যের এই ঔজ্জ্বল্যহীনতা ও নিষ্প্রভতার কারণ সম্বন্ধে তাঁকে জানাতে আদেশ দিলেন। প্রকৃতি বিষয়ক পারিষদ সসম্ভ্রমে সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'হে মহামান্য সম্রাট। সূর্যের এবং চন্দ্রের আত্মা এতদিন সিল্লা রাজ্যের ছিল; কিন্তু কিছুদিন হল তাঁদের আত্মা রাজ্যকে বিদায় জানিয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে। তার ফলেই আমাদের রাজ্যে প্রাকৃতিক এই পরিবর্তন হয়েছে।'

রাজা একথা শুনে বিস্মিত হলেন এবং তখনই তাঁর এক বিশেষ দূতকে ডেকে আদেশ দিলেন—'এখনই তুমি পূর্বদিকের দ্বীপে চলে যাও এবং ওখানে গিয়ে খোঁজ করে ইয়োনোরাং এবং সোয়েনিওকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এস।' রাজার আদেশ পালন করে দূত সেই দ্বীপে গেল এবং সেখানে ওদের দেখতে পেল। দূতের কথা শুনে ইয়োনোরাং ও সোয়েনিও জানাল—'ঝড় তুফানের বেগে আমরা এই দ্বীপে এসে পৌঁছে কোনরকমে বেঁচেছি। এই দ্বীপের অধিবাসীরা আমাদের উদ্ধার করে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করে অতি যত্নে রেখেছেন। আমরা এখন এদের শিক্ষাগুরু। আমাদের এরা যুবরাজ আর যুবরাণীর সম্মান দিয়েছে। তাই আমাদের আর ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই।'

রাজার দূত তাদের এই কথা শুনে হতবাক। সে তখন তাদের জানাল যে সিল্লার আকাশের সূর্য ও চন্দ্র তাদের ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, তাদের আর কিরণ নেই। ফলে লোকজনরা ক্ষুধায় এবং শীতে কাঁদছে।

ইয়োনোরাং উত্তরে জানাল—'এটা বিশেষ কোন সমস্যাই নয়। আমার স্ত্রীর নিজের হাতে বোনা একখণ্ড খুব পাতলা সিল্কের সুন্দর কাপড় আছে। আমি সেটি তোমাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি। এটি যদি তুমি নিয়ে যাও এবং স্বর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদন কর, তাহলে দেখবে কি বিস্ময়কর ফল হবে।'

নিরাশ দূত ঐ উপহারটি নিয়ে সিল্লায় ফিরে গেল এবং সেখানে পৌঁছেই সে সোজা রাজ দরবারে চলে গেল। রাজাকে সে সমস্ত ঘটনা জানাল। রাজা সব কথা শুনে তাঁর সব সামরিক ও বেসামরিক পারিষদদের ডাকলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সাণ্ডোসান পাহাড়ে উঠলেন। সেখানে উঠে তিনি ভাবগম্ভীর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ সিল্কের কাপড়টি স্বর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন এবং সূর্যকিরণ ও চন্দ্রকিরণের জন্য প্রার্থনা জানালেন।

সেই অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই কালো মেঘগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে চলে গেল এবং সূর্য তার উজ্জ্বল কিরণ নিয়ে আকাশে দেখা দিল। তারপর ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গ্রীষ্মের উত্তাপ এসে গেল। গাছে গাছে ফুল ফুটে উঠল, ফলগাছগুলি ফলে ভরে উঠল। ক্ষেতে প্রচুর শস্য হল এবং খাদ্যের অভাব দূর হল। লোকেরা গান গেয়ে উঠল—'ক্ষুধা হল নরক, আহারই স্বর্গ।'

রাজার মুখে হাসি ফুটল। তিনি ঐ আশ্চর্য সিল্কের কাপড়টিকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে পূজা করলেন এবং ইয়ুং-ইল নামে সামুদ্রিক বন্দরে একটি জায়গায় আলাদা এক প্রাসাদে ওটি সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করলেন। ইয়ুং-ইল এর মানে হল—'স্বাগত সূর্য'।

পরী ও দুই বোন

অনেকদিন আগে এক ভদ্রমহিলা বাস করতেন ; তাঁর ছুটি মেয়ে ছিল। বড় মেয়েটির চেহারা এবং কথাবার্তা ছিল ঠিক তার মায়ের মতন। মা এবং মেয়ে সমান বদমেজাজী এবং অহঙ্কারী হওয়ায় তাদের একসঙ্গে বসবাস করা প্রায় ছঃসাধ্য ছিল।

ছোটমেয়েকে দেখতে অনেকটা বাবার মত ছিল। সে খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির ও দয়ালু ছিল এবং তাকে দেখতেও খুব সুন্দর। বড় মেয়েটি ছিল মায়ের প্রিয় এবং ছোট মেয়েকে মা দেখতে পারতেন না। মা তাকে রান্নাঘরেই খেতে দিতেন এবং আজে বাজে কাজে খুব খাটাতেন। প্রতিদিন ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আসা ছিল তার একটি কর্তব্য। ঝর্ণাটি ছিল তাদের বাড়ী থেকে এক মাইলেরও বেশী দূরে। একদিন একটি গরীব মহিলা ঝর্ণার কাছে এসে মেয়েটির কাছে জল খেতে চাইলেন।

মেয়েটি বলল—আমি নিশ্চয়ই আপনাকে জল দেব। এই বলে সে কলসীটি ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার জল নিল এবং এমনভাবে জল দিল যাতে মহিলাটি সহজেই জল পান করতে পারেন। জল পান শেষ করে মহিলাটি বললেন—তুমি এত সুন্দর, ভাল এবং দয়ালু, সেজন্য আমি তোমাকে একটি উপহার দেব।

এই মহিলাটি আসলে একটি পরী। মেয়েটি কেমন পরীক্ষা করার জন্য উনি একজন গ্রামের গরীব মহিলার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

মহিলাটি বললেন—আমি তোমাকে এই উপহার দেব যে তুমি কথা বলার সময় তোমার মুখ থেকে একটি করে ফুল ও দামী পাথর বেরিয়ে আসবে।

মেয়েটি বাড়ী ফিরলে ঝর্ণা থেকে জল আনতে দেরী হওয়ার জন্যে তার মা তাকে খুব বকাবকি করলেন।

মেয়েটি বলল—আমার দেরি হয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর।

যখনই মেয়েটি কথাগুলি উচ্চারণ করল, তখনই তার মুখ থেকে দুটি গোলাপ ফুল, দুটি মুক্তা ও দুটি বড় আকারের হীরা বেরোল।

অবাক বিস্ময়ে তার মা বললেন—এ আমি কি দেখছি? মুক্তা এবং হীরা! আচ্ছা 'মেয়ে' বলত, এগুলো কোথা থেকে এল?

ওই অসুখী মেয়েটির জীবনে এই প্রথম মা তাকে 'মেয়ে' বলল। মেয়েটি তখন মাকে সব ঘটনা বলল। বলার সময় মেয়েটির মুখ থেকে আবার অনেকগুলি হীরা এবং গোলাপ ফুল বেরোল।

মা বলল—এবার অবশ্যই আমার বড় মেয়েকে পাঠাবো। মার মতে বড় মেয়েটি ছিল তার সত্যিকারের মেয়ে। তিনি বড় মেয়েকে ডেকে বললেন—ফ্যান্‌চন, তুমি দেখছ তোমার বোন যখন কথা বলছে তার মুখ থেকে কত হীরা মুক্তা বেরোচ্ছে? তুমিও নিশ্চয়ই এরকম শক্তির অধিকারী হতে চাও? এজন্য তোমাকে ঝর্ণায় জল আনতে যেতে হবে এবং যখন কোন গরীব মহিলা তোমার কাছে জল খেতে চাইবে, তুমি তখন তাকে জল দেবে।

বড় মেয়েটি অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

মা তখন তাকে আদেশ করলেন—আমি চাই যে তুমি যাও এবং এখনই তুমি যাবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্যান্‌চন যেতে বাধ্য হল। যাবার সময় সে বাড়ীর সবচেয়ে সুন্দর রূপার জগটি নিয়ে গেল।

ঝর্ণার কাছে পৌঁছে সে দেখল বনের ভেতর থেকে খুব দামী

পোষাক-পরা এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি তার কাছ থেকে জল খেতে চাইলেন।

তিনি সেই একই পরী ; কিন্তু এবার তিনি যুবরাণীর পোষাকে এসেছিলেন এই বোনটি কিরকম খারাপ প্রকৃতির দেখবার জন্য।

ফ্যান্‌চন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—আপনিই কি তিনি যাঁকে জল দেবার জন্য আমি এখানে এসেছি ? সে বলল—আমি বিশেষ করে আপনার জন্যে রূপার জগ এনেছি। আপনি যদি চান এবার জল পান করে নিন।

রাগ না করে পরী মন্তব্য করলেন—তুমি দেখছি বেশ নম্র ও বিনয়ী নও। ঠিক আছে, তোমার যখন এইরকম প্রকৃতি, তোমাকে আমি এমন শক্তি দিচ্ছি—যখনই তুমি কথা বলবে তোমার প্রতিটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কট্‌কটে ব্যাঙ এবং সাপ বেরোবে।

মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল বল ?

ফ্যান্‌চন উত্তর দিল—কি আর হল ?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে দুটি কট্‌কটে ব্যাঙ এবং দুটি বিষধর সাপ বেরোল।

মা বলে উঠলেন—এ আমি কি দেখছি ? এসবই তোমার বোনের দোষে। আমি ওকে মজা দেখাচ্ছি।

ছোট মেয়েকে মারবার উদ্দেশ্যে মা তার পেছনে দৌড়লেন এবং হতভাগ্য মেয়েটি কাছাকাছি বনে লুকিয়ে পড়বার জন্য দৌড়ে পালিয়ে গেল।

ওই সময় রাজার ছেলে শিকার করে ওই পথে ফিরছিল। সে মেয়েটিকে লুকোতে দেখেছিল এবং তার মনে হয়েছিল মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সে কাছে এসে ওকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি একলা এখানে বনে কাঁদছ কেন ? মেয়েটি উত্তর দিল—আমার মা আমাকে মারবার জন্য তাড়া করেছেন ; তাই আমি এখানে চলে এসেছি।

রাজার ছেলে লক্ষ্য করল যে মেয়েটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার

মুখ থেকে পাঁচ-ছ'টি মুক্তা এবং গোলাপ ফুল বেরিয়ে পড়ল। সে তখন মেয়েটির কাছ থেকে জানতে চাইল—কি ব্যাপার ?



মেয়েটি তখন সব ঘটনা তাকে বলল। সব শুনে রাজার ছেলের মনে হল এত গুণসম্পন্ন মেয়ে আর পাওয়া যাবে না।

সে তখন তাকে সঙ্গে করে রাজার প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে তাদের বিয়ে হল এবং তারপর তারা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

টমের কীর্তি

অনেকদিন আগে এক সময় বেড়ালদের মানুষের মতই গণ্য করা হত। সেই সময় একদিন টম্ নামে একটি সুন্দর বেড়াল তার ঝাঁটার মত গোঁফ ছাঁটবার জন্য একটি নাপিতের দোকানে গিয়ে ঢুকল। নাপিত কাঁচি দিয়ে যখন তার গোঁফ কাটছিল, তখন সে দেখল বেড়ালের লেজটি খুব বেশী লম্বা এবং লেজের লোমগুলি পেঁজা তুলার মত। ওই দেখে আরও কিছু বেশী পয়সা আদায় করার মতলবে নাপিত টম্‌কে বলল—দেখুন মশাই, আপনার লেজটি সুন্দর, কিন্তু এত বেশী লম্বা যে আপনার চেহারার পক্ষে একটু বেমানান। এটি যদি কেটে একটু ছোট করে দেওয়া হয়, তাহলে আপনাকে আরও অনেক সুন্দর দেখতে হবে।

নাপিতের এই কথা টমের মনে ভালই লাগল। সে বয়সে তরুণ এবং একটু দাম্ভিক প্রকৃতির। সে নাপিতকে বলল—ঠিক আছে, আপনি বুঝেসুঝে মানানসই করে লেজটি ছোট করে কেটে দিন। নাপিত তার কথা অনুযায়ী ক্ষুরটি শান দিয়ে নিয়ে টমের লেজটির ভাল অংশটাই কেটে বাদ দিয়ে দিল। এর জন্যে সে ওর কাছ থেকে দ্বিগুণ পয়সাও নিল।

তাকে আগের চেয়ে এখন বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে ভেবে সে সগর্বে নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়েই তার মনে হল—নাপিত আমার লেজের কাটা অংশটা ত ফেরত দিল না; ও রেখে দিল কেন? সে আবার দোকানে ফিরে গিয়ে লেজের কাটা

অংশটা চাইল। নাপিত ইতিমধ্যে দোকান ঝাঁট দিয়ে লেজের অংশ সুদ্ধ সব জঞ্জালের টবে ফেলে দিয়েছিল। নাপিত তাকে সেকথা জানিয়ে বলল—এখন কি করে ফেরত দেব?

টম্ বলল—আমার লেজের কাটা অংশ ফেরত দিন, নাহলে আমি আপনার একটি ক্ষুর নিয়ে নেব।

নাপিত তাকে জানাল জঞ্জাল ঘেঁটে তার লেজের কাটা অংশ খুঁজে বার করে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। টম্ তখন লাফিয়ে উঠে একটি ক্ষুর তুলে নিয়ে দৌড়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মনে মনে খুব খুশী হয়ে টম্ বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর টম্ দেখল এক ভদ্রমহিলা ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে যাচ্ছেন। মাছগুলি কাটবার মত কোন ছুরি তার কাছে নেই দেখে সে হঠাৎ একটু দুঃখ বোধ করল এবং তাঁর কাছে গিয়ে বলল—আপনি এই ক্ষুরটি নিন। আমার এটির কোন দরকার নেই। আপনার বরং মাছ কাটার সময় এটি কাজে লাগবে। ভদ্রমহিলা তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিল। একটা উদারতা দেখাতে পেরেছে ভেবে সে খুশীমনে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। হঠাৎ তার মনে হল ক্ষুরটি নিয়ে ভদ্রমহিলার উচিত ছিল তাকে একটি মাছ দেওয়া। মহিলার মন ভাল নয়, তা না হলে উনি নিজেই ত তাকে একটি মাছ দিতেন। সে আবার ফিরল এবং ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে মাছ দাবী করল। তিনি দিতে রাজী না হওয়ায় টম্ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝুড়ি থেকে একটি মাছ তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর টম্ একটি আটা, গম ইত্যাদি ভাঙার কলের সামনে এসে পৌঁছল এবং দেখল যে ঐ কল যিনি চালান, তিনি বাইরে একটি বেঞ্চে বসে শুকনো রুটি দিয়েই রাত্রের খাওয়া সারছেন। তাই সে রুটির সঙ্গে খাবার জন্য মাছটি তাকে দিল। কত উদারতা দেখান হল, এই ভেবে সে এগিয়ে চলল। একটু দূরে গিয়েই তার মনে হল এই উদারতা দেখান তার ঠিক

হয়নি ; দৌড়ে সে ওখানে ফিরে গিয়ে সেই লোকটির কাছে মাছ ফেরত চাইল। ক্ষুধার্ত সেই লোকটি ততক্ষণে মাছটি খেয়ে ফেলেছে।



তাই সে বলল—ইচ্ছে থাকলেও আমি ত এখন আর মাছ ফেরত দিতে পারব না।

টম্ বলল—তাহলে আমি তোমার ময়দার একটি থলি নিয়ে যাব। এই বলে সে একটি থলি তুলে নিয়ে দৌড়ল।

রাস্তায় আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে টম্ একটি স্কুলের সামনে এসে পৌঁছল এবং দেখল যে ওই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী বেশ রোগা এবং গরীব ; তারপর শুনল যে তাঁর ও ছাত্রীদের রাত্রে খাবার মত কিছু

নেই। তখন সে তাঁকে ময়দার থলিটি দিল এবং বলল—এই দিয়ে কিছু খাবার তৈরী করে আপনিও খান এবং ছাত্রীদেরও দিন। তারপর সে আবার এগিয়ে চলল। তার মনে এবারও খুব আনন্দ যে সে ওদের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ; কিন্তু কিছুদূর যাবার পর তার মনে হল যে এই উদারতা দেখিয়ে সে ত বোকামী করেছে। তাই সে স্কুলে ফিরে গিয়ে ময়দা ফেরত চাইল। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ততক্ষণে খাবার তৈরী করে নিজেও খেয়েছেন এবং ছাত্রীদেরও খাইয়ে দিয়েছেন। তাই ফেরত দেবার মত ময়দা আর ছিল না। টম্ এই দেখে খুব রেগে গিয়ে বলল—তাহলে ওর বদলে আমি আপনাদের একজন ছাত্রীকে নিয়ে যাব। এই বলে সে একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

ছোট মেয়েটিকে পিঠে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে টম্ একটু দূরে গিয়েই বেশ ক্লান্ত বোধ করল। সামনেই একটি লণ্ড্রী ছিল। সে মেয়েটিকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে লণ্ড্রীর মহিলা কর্ত্রীকে বলল—এই মেয়েটিকে দিয়ে গেলাম, এ আপনার কাজে সাহায্য করলে আপনি অনেক তাড়াতাড়ি কাজগুলি সেরে ফেলতে পারবেন। ওই কর্ত্রীর বয়স হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তাই তিনি খুব কৃতজ্ঞ হলেন। মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে টম্ হালকা হয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল। কিছুদূর গিয়ে তার মনে হল এর বদলে আমার ত কিছু পাওয়া উচিত ছিল। আমি ত কিছু না পেয়েই চলে এলাম। এই ভেবে আবার সে লণ্ড্রীতে ফিরে এল এবং একটি সার্ট চাইল। সার্টগুলি ত অন্য লোকের ; তাই কর্ত্রী তাঁকে ত দিতে পারেন না। সেকথা তিনি টম্‌কে বললেন। টম্ কোন কথা না শুনে একটি সার্ট তুলে নিয়ে দে দৌড়।

বিজয়ীর গর্বে সার্টটিকে বগলদাবা করে টম্ সগর্বে আবার এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ চলার পর তার ক্লান্তি বোধ হল এবং সে ভাবল সার্টটা নিয়ে কি করি? সেই সময় ওখান দিয়ে একজন বেহালাবাদক

তার সুন্দর বেহালাটি নিয়ে যাচ্ছিল। বেহালাটি তার গর্বের বস্তু ছিল ; কিন্তু বেহালা বাজিয়ে সে বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারত না। তাই তার গায়ে সার্ট ছিল না, যা জামা কাপড় সে পরেছিল সেগুলি অপরিচ্ছন্ন এবং তাতে দারিদ্র্যের ছাপ ছিল।

টম্ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—তোমার দেখছি সার্ট নেই ; তুমি এই সার্টটি নাও।

বেহালাবাদক সার্টটি নিল এবং গায়ে পরে ফেলল। জামাটি তার গায়ে ঠিক হয়েছে দেখে সে খুশীই হল। তারপর ফিরেই দেখল যে টম্ বেড়াল তার বেহালাটি নিয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। ওই লোকটি অবশ্য খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারত না। বেহালাটি চলে যাওয়ায় সে ভাবল এখন তাকে একটা কাজ জোগাড় করতে হবে। সে লিখতে এবং পড়তে পারত ; তাই সে এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছে কেরানীর কাজ পেয়ে গেল। কিছুদিন পর তার মনে হল সে ত ব্যবসার ব্যাপার বেশ ভালই বোঝে। সে বেশ চালাকও ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই সে নিজে ব্যবসা করে ওই ব্যবসায়ীর চেয়েও ধনী হয়ে গেল। তখন সে এক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করল এবং সুন্দর বাগানে ঘেরা একটি বড় বাড়ীতে বাস করতে লাগল।

টম্ বেহালাটি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে একটি সরাইখানার কাছে পৌঁছে আপন মনে বেহালাটি বাজাতে লাগল। তার বাজনা খুব ভাল হয়েছিল। তাই সে যখন টুপি নিয়ে চার-পাশের শ্রোতাদের কাছে পয়সা নিচ্ছিল, তখন টুপিতে অনেক পয়সা পড়ল। এই সাফল্যে সে খুব উৎসাহিত হল এবং ভাল করে বেহালা বাজান অভ্যাস করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই সে একজন খ্যাতনামা বেহালাবাদক হয়ে উঠল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজারা তাকে রাজসভায় বেহালা বাজানোর জন্য আমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

দেবতা ও মানুষ

কাবেজিয়া মুংগু হলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং দুটি মানুষ—একটি পুরুষ ও একটি নারী সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষদের তিনি 'বুদ্ধি' দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাদের 'মুটিমা' বা হৃদয় ছিল না।

কাবেজিয়া মুংগুর ছিল চারটি সন্তান—সূর্য, চন্দ্র, অন্ধকার এবং বৃষ্টি। তিনি একদিন তাদের সকলকে এক জায়গায় ডাকলেন এবং তাদের বললেন—আমি এবার নিজেকে সরিয়ে নিতে চাই যাতে মানুষ আর আমাকে দেখতে না পায়। আমার বদলে আমি 'মুটিমা'কে পৃথিবীতে পাঠাব। আমি অবসর গ্রহণ করার আগে জানতে চাই, তোমরা কে কি করবে।

তিনি প্রথমে বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করবে?

বৃষ্টি উত্তর দিল—আমি সমানে বৃষ্টিপাত করে যাব এবং সবকিছু জলে ডুবিয়ে দেব।

দেবতা বললেন—না, তুমি তা কোর না। মানুষ দুটির দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন—এদের দিকে দেখ। তুমি কি মনে কর এরা জলের নীচে বসবাস করতে পারবে? তুমি বরং সূর্যের সঙ্গে পালা ভাগ করে নাও। তুমি পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত করে ভালভাবে সব ভিজিয়ে দেবার পর, সূর্য যাবে এবং গিয়ে সূর্যালোক দিয়ে সব শুকিয়ে দেবে।

ভগবান সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করবে ভাবছ? দ্বিতীয় সন্তান সূর্য উত্তর দিল—আমার ইচ্ছা আমি খুব উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলব এবং আমার উত্তাপের মধ্যে যা যা আসবে সব পুড়িয়ে দেব।

কাবেজিয়া মুংগু বললেন—না, তা হতে পারে না। আমি যে দুটি মানুষ সৃষ্টি করেছি তারা খাদ্য পাবে কি করে ভেবে দেখেছ? তুমি যখন বেশ কিছুক্ষণ উত্তাপ দিয়ে পৃথিবীকে গরম করে দেবে তারপর বৃষ্টিকে সুযোগ দিও যাতে সে বৃষ্টিপাত করতে পারে এবং ফলমূল জন্মাতে পারে।

তারপর তিনি অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি পরিকল্পনা বল।

অন্ধকার উত্তর দিল—আমি চিরদিন সব অন্ধকারে ঢেকে দিতে চাই।

দেবতা চেঁচিয়ে উঠলেন—একটু কৃপা কর। তুমি কি চাও আমি যেসব জীব সৃষ্টি করেছি—সিংহ, বাঘ, সাপ, তারা আমার সৃষ্টি করা পৃথিবীর কিছুই দেখতে না পায়? আমার কথা শোন। চন্দ্রকে তুমি কিছু সময় দিও পৃথিবীতে আলো দেবার জন্যে এবং চন্দ্র যখন এক একবার তার পরিক্রমার শেষ ভাগে পৌঁছবে, তখন তুমি আবার অন্ধকারে ঢেকে দিও।

যাই হোক, আমি অনেকক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এবার আমি যাই। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে 'মুটিমা' বা হৃদয় এল একটি ছোট পাত্রে। পাত্রটি এক হাতের মুঠোর চেয়ে বড় হবে না।

'মুটিমা' কাঁদছিল এবং সূর্য, চন্দ্র, অন্ধকার ও বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা করছিল—আমাদের বাবা কাবেজিয়া মুংগু কোথায়?

তারা উত্তর দিল—বাবা চলে গেছেন। কোথায় গেছেন আমরা জানিনা।

'মুটিমা' বলল—তাঁর সঙ্গে দেখা করার এবং কথা বলার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যখন দেখাই হল না, তখন আমি মানুষের মধ্যেই প্রবেশ করব এবং যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে দিয়েই আমি তাঁর দর্শন পাবার জন্য প্রার্থনা করব।

তাই-ই হল। তখন থেকেই মানুষের যত সন্তান জন্মগ্রহণ করল তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে থাকল 'মুটিমা' বা হৃদয় আর সেই সঙ্গে তাদের সকলের মনে রইল ভগবানের দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা।

উপহার

এক সময় এক গ্রামে পল নিকোলাস নামে একজন লোক তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে বাস করতেন। তিনি মোজা বুনে কোনরকমে জীবন ধারণ করতেন। ছেলে তিনটির ছিল মায়ের মত কাল চুল ও উজ্জল চোখ এবং মেয়েদের ছিল বাবার মত বাদামী চুল এবং ঘন নীল চোখ। তাদের পরিবারটি ছিল বেশ সুখী পরিবার। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ভালবাসত এবং পরস্পরকে সব কাজে সাহায্য করত। নিকোলাসের হাতে সব সময় মোজা বোনার খুব কাজ থাকত না ; তাই তাঁরা ছিলেন খুব গরীব। অনেকসময় তাঁরা পেট ভরে খেতে পারতেন না এবং বড়লোক পিতামাতার সন্তানদের মত তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ বা খেলনা ইত্যাদি কিনতে পারত না। কিন্তু তা হলেও তারা এজন্য দুঃখিত হোত না বা কাউকে ঈর্ষা করত না। তারা কখনও কোন বিষয়ে অভিযোগও করত না। পরিবারে কারুর যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে তারা খুব খেয়াল রাখত। মেয়েরা বাড়ীতে মায়ের কাজে সাহায্য করত এবং ছেলেরা বনের ভেতর গিয়ে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে আনত।

গ্রীষ্ম ও হেমন্তকালে তারা সকলেই ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা), বাদাম এবং কালজাম ইত্যাদি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ত এবং সেগুলি তারা সহরে বিক্রী করত। ছেলেরা কাছাকাছি চাষীর ক্ষেতে চাষীভাইদের সঙ্গে নানা কাজে সাহায্য করে কিছু পয়সা উপার্জন করত এবং তা দিয়ে তারা সকলের জন্য কিছু খাবার দাবার কিনত।

শীতকালটাই এই পরিবারের পক্ষে ছিল সবচেয়ে খারাপ সময়।

তখন কাজও কমে যেত, আর জিনিষপত্রের দামও বাড়ত। বড়দিনের সময় সাধারণতঃ সকলেই আনন্দ করত, সকলের মনেই একটা খুশির ভাব থাকত। একবার শীতকালে বড়দিনের কিছুদিন আগে নিকোলাসের ইচ্ছা হল যে তাঁর স্ত্রীকে এবং ছেলেমেয়েদের একদিন একটু ভাল করে খাওয়াবেন। মোজা বোনার কাজে তাই তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করলেন এবং অনেক দূরে দূরে সহরে গিয়ে সেগুলি বিক্রী করার জন্য খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হল না।

প্রতিবেশীদের বাড়ীতে সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রি নিয়ে আসা হবে এবং দোকানে দোকানে খেলনা এবং নানা সুদৃশ্য জিনিস সাজান হবে এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা সেগুলি কেবল তাকিয়ে দেখবে, তাদের বাড়ীতে বড়দিনের সময় এসব কিছুই আনা সম্ভব হবে না—এইসব ভেবে তার মনে খুব কষ্ট হল।

ছেলেরা দেখবে যে অন্যরা আনন্দে মেতে উঠেছে আর তারা ক্ষুধার্ত থাকবে। তিনি জানতেন যে সেজন্য অবশ্য ছেলেমেয়েরা কোন দুঃখ প্রকাশ করবে না বা অভিযোগও করবে না ; এত ভাল স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের একটু আনন্দ দেবার জন্যে কিছুই তিনি করতে পারছেন না একথা মনে হওয়ায় তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

বড়দিনের দু'সপ্তাহ আগে একদিন এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাঁকে বললেন যে বড়দিনের আগের দিন বিকাল পর্যন্ত তিনি যত মোজা বুনতে পারবেন, সব তিনি কিনে নেবেন। এই শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই ভাল খবরটি নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে সকলকে বললেন। খবরটি শুনে ছেলেমেয়েরা খুব খুশী হল। তিনি বললেন যে এই টাকা পেলে বড়দিন উপলক্ষ্যে সকলকে ভোজ দেবেন এবং একটি খ্রীষ্টমাস গাছ আনবেন, তাতে সকলের জন্য উপহার ঝুলবে। যখন মনে হচ্ছিল তাঁদের ভাগ্য খারাপ, এমন সময় এত আনন্দের খবর জেনে তারা লাফালাফি ও চীৎকার করে এবং হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিল।

যাতে অনেক মোজা তিনি ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দিতে পারেন সেজন্য পরের বেশ কয়েকদিন নিকোলাস নাওয়া-খাওয়া ভুলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মোজা বুনতে লাগলেন। সব তৈরি হয়ে গেলে মোজাগুলি দিতে যাবার আগে তিনি ছেলেদের বললেন বন থেকে দেবদারু জাতীয় গাছের একটি বড় ডাল জোগাড় করে এনে রাখতে। ওটি দিয়ে 'খ্রীষ্টমাস ট্রি' হবে। তিনি তাদের কথা দিয়ে গেলেন যে তিনি ফেরার সময় তাদের সকলের জন্য উপহার এবং বড়দিনের ভোজের জন্য একটি রাজহংসী নিয়ে আসবেন। পিঠের ওপর মোজা-ভর্তি ঝোলাটি ফেলে তিনি রওনা হলেন।

সেদিন শীতের সকালটি ছিল সুন্দর। মাটিতে বেশ পুরু বরফের স্তর আর ওপরে নীল আকাশ। সূর্যের আলো পড়ছিল নিকোলাসের গায়ে। তিনি তাঁর পরিবারের জন্য অনেক জিনিসপত্তর কিনে আনতে পারবেন ভেবে তাঁর মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাঁর পিঠে ভারী ঝোলা রয়েছে এবং তাঁকে অনেকটা পথ যেতে হবে। তিনি মোটেই ক্লান্তও বোধ করছিলেন না। পথের মধ্যে তিনি একবার খালি এক খামার বাড়ীতে থেমেছিলেন। সেখানে তিনি একটি হৃষ্টপুষ্ট রাজহংসী দেখতে পেয়েছিলেন এবং খামারের মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কত দাম দিলে তিনি ওই রাজহংসীটি বিক্রী করবেন। তিনি নিকোলাসকে দেখেই বুঝেছিলেন উনি গরীব লোক। বড়দিন আসছে বলে তাঁর মনটাও ভাল ছিল। তিনি বললেন যে সস্তা দামেই তিনি দিয়ে দেবেন। নিকোলাস তাঁকে বললেন,যে সহর থেকে ফেরার পথে তাঁর কাছে অনেক টাকা থাকবে এবং তিনি বাড়ীতে বড়দিনের ভোজের জন্য রাজহংসীটি কিনে নিয়ে যাবেন।

সহরে পৌঁছে নিকোলাস সোজা ওই ব্যবসায়ীর বাড়ীতে চলে গেলেন ; কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলেন যে তিনি বাড়ীতে নেই। তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ওই ব্যবসায়ীর কর্মচারী ওঁকে জানাল যে তিনি একঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন এবং বলল যে টাকাটা নিতে

ওঁকে তিনদিন পরে আসতে হবে। তখন ওই ব্যবসায়ী বাড়ী ফিরে আসবেন। গভীর হতাশায় নিকোলাস চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরোচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি ঐ কর্মচারীটিকে অনেক অনুনয় করে বললেন—আমাকে আমার পাওনা থেকে কিছু টাকা দিন, যাতে আমি আমার ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ের জন্য অন্ততঃ কিছু রুটি কিনে নিয়ে যেতে পারি। কর্মচারীটি জানালেন যে তাঁর কাছে দেবার মত টাকা নেই ; তাই তাঁকে তিনদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

নিকোলাস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কোথায় গেছেন? আমি যদি তাড়াতাড়ি যাই, ওঁকে কি ধরতে পারব না? কর্মচারীটি উত্তরে জানাল—সবচেয়ে দ্রুত দৌড়তে পারে এমন ঘোড়ায় চেপে উনি রওনা হয়েছেন ; সুতরাং দৌড়ে গেলেও ওঁকে ধরা যাবে না।

নিকোলাস এই কথা শুনে বসে পড়লেন এবং বুঝলেন যে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ হবে না। তখন তিনি আর কোন উপায় না দেখে খালি থলিটি নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। দিনটি তাঁর কাছে কিরকম যেন বদলে গেল! অত সূর্যোজ্জ্বল সকালে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, আর এখন অপরাহ্নবেলা কত নিষ্প্রভ। মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। যে আকাশ সকালে উজ্জ্বল নীল ছিল, এখন তা সীসের মত দেখাচ্ছে। হতভাগ্য নিকোলাসের মনের অবস্থা বাইরের প্রকৃতির মতই দুঃখভারাক্রান্ত। এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি কষ্ট করে পা টেনে টেনে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন। তাঁর মনে ছেলেমেয়েদের ব্যগ্র মুখগুলি ভেসে উঠল এবং কিভাবে তাদের নিরাশার খবরটি দেবেন তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। বড়দিন উপলক্ষে ভোজ ত হবেই না এবং তারা কোন উপহারও পাবে না, বেচারীদের কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়তে হবে। এই সব ভেবে তার মন বেশ খারাপ হয়ে গেল।

এরকম নানা চিন্তায় তাঁর খেয়ালই হয়নি যে কত রাত্রি হল এবং বনের মধ্যে কাল অন্ধকার কিরকম ঘনিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল কিছু দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। এই দেখে তাঁর খুব আশ্চর্য লাগল এবং যে রাস্তায় তিনি এসেছিলেন, সেদিকে না গিয়ে তিনি ঐ আলোর দিকে এগোতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে গাছের ডালে অনেক আলো ঝুলছে এবং প্রচুর আপেল, নাসপাতি, বাদাম, মিষ্টি খাবার, পুতুল ইত্যাদিও ঝুলছে।

অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে তিনি যখন ঐ দৃশ্য দেখছিলেন, একটি ছোটখাট ভদ্রলোক তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। এত বেঁটে কোন লোক তিনি আগে দেখেন নি। তিনি কিন্তু বেশ মূল্যবান পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল খুব দামী ফার-এর পোশাক, পায়ে লাল চামড়ার জুতা এবং মাথায় ছিল সাদা নেংটি ইঁদুরের চামড়ার টুপি। তাঁর উচ্চতা ছিল এক ফুটের মত। এই অস্বাভাবিক চেহারার লোকটিকে দেখে নিকোলাস হাসবেন না কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না।

ওই ছোট্ট লোকটি নীচু হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বেশ ভদ্র ভাবে বললেন—আপনিই ত পল নিকোলাস ? আপনি ত মোজা বুনে বিক্রী করেন ? আমি জানি আপনি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত এবং বিমর্ষ—কারণ বড়দিন উপলক্ষে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্যে আপনি কিছুই নিয়ে যেতে পারছেন না। আপনার ছেলেমেয়েরা খুব ভাল। নিকোলাস তাঁর এই কথা শুনে মাথা থেকে টুপি খুলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন।

ছোট্ট লোকটি বললেন—আপনার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার ; আপনাকে ত এতটা রাস্তা হেঁটে বাড়ী যেতে হবে আর আপনার থলি খুব ভর্তি ও বেশ ভারী হয়ে যাবে। এই বলে ফার গাছের ডালপালা এবং গাছের ছাল দিয়ে তৈরি ছোট একটি ঘরের

মত জায়গায় লোকটি তাঁকে নিয়ে গেলেন। ওখানে অল্প একটু আগুন জ্বলছিল ; ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা একটি টেবিল এবং গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরী একটি চেয়ারও ছিল। টেবিলে ঢাকা দেওয়া ডিসে খাবার ছিল ; তা থেকে খুব লোভনীয় গন্ধ বেরোচ্ছিল। লোকটি নিকোলাসকে টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে একটু মাথা নীচু করে বললেন—আপনি এবার খেয়ে নিন। বিস্মিত নিকোলাস চেয়ারে বসে খাবার ডিসের ওপরের চাপাটি তুলে দিতেই ব্রাউন রংয়ের ঘন ঝোলে খরগোস ও ব্যাঙের ছাতার খাবারের সুন্দর গন্ধ পেলেন। এত অপূর্ব সুস্বাদু খাবার তিনি জীবনে খাননি।

নিকোলাস ওঁকে নাম জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ওঁর নাম কাউণ্ট চার্লস গুডফ্রেণ্ড। খাওয়া হয়ে গেলে নিকোলাস উঠে পড়ে তাঁকে সহৃদয় অতিথিসেবার জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং বড়দিনের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানালেন।

লোকটি বললেন—একটু দাঁড়ান। আপনার ঝোলাতে আপনি কিছু জিনিস নিয়ে যেতে পারবেন কি? নিকোলাস জানালেন তিনি পারবেন। বিভিন্ন গাছে যে নানারকম ভাল জিনিস ঝুলছিল, ওই লোকটি তাঁকে সেই গাছগুলির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—আপনার থলিতে যত ধরে, ওর মধ্যে থেকে আপনি তত জিনিস নিয়ে নিন। অবশ্য আপনি যদি আমার পরামর্শ চান, তাহলে আমি বলব—আপেল আর নাসপাতি আপনি বেশী করে নিন। তাঁর কথামত তিনি আপেল আর নাসপাতিই বেশী করে নিলেন, যদিও মিষ্টি খাবার ও খেলনা পুতুল নেবার আরও জায়গা তাঁর থলিতে ছিল।

ঝোলা ভর্তি হয়ে গেলে নিকোলাস ওই দয়ালু ছোট্ট ভদ্রলোকটিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করে ঝোলাটি পিঠে ফেলে রওনা হতে যাচ্ছিলেন এমন সময় কাউণ্ট গুডফ্রেণ্ড তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন—আপনি যা পেলেন সেগুলির যথাযথ যত্ন নেবেন এবং সেগুলি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করবেন ; কেননা এগুলি

হল আপনার পরিবারকে দেওয়া উপহার এবং পুরস্কারও বটে। আপনার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি এবং অন্য



লোকদের প্রতিও খুব সহানুভূতিশীল এবং তারা কখনও দুঃখকষ্টের জন্য কোন অভিযোগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করে না।

ওঁর কথা শেষ হলে পরে গাছে ঝোলানো আলোগুলি কমতে কমতে নিভে গেল। নিকোলাস তখন অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে। যাই হোক, আর দেরী না করে পিঠে ঝোলা নিয়ে তিনি কোনরকমে রাস্তায় এসে পৌঁছলেন এবং আনন্দিত মনে একটু পা চালিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। ছেলেমেয়েদের জন্য এতগুলি ভাল ভাল জিনিস পেয়ে তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে পিঠের বোঝার ভারের জন্য তিনি কোন কষ্টবোধ করছিলেন না। কিন্তু যতই তিনি এগোচ্ছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে বোঝাটি যেন ক্রমশঃ আরও বেশী ভারী হয়ে উঠছিল। তিনি যখন তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন ঝোলাটি তখন এত ভারী হয়ে উঠেছিল যে তিনি পিঠ থেকে নামাতে বাধ্য হলেন এবং একজন পথচারীকে অনুরোধ করলেন তাঁকে ঝোলাটি বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য। একটু পরে ঝোলাটি আরও ভারী হয়ে উঠল, তখন তাঁদের দুজনের পক্ষেও ওটি নিয়ে যাওয়া শক্ত হল এবং তাঁরা আর একজন পথচারীকেও তাঁদের সাহায্য করতে ডাকলেন। কিছু দূরে যেতে না যেতে ঝোলাটি আরও ভারী হওয়ায় তাঁদের চতুর্থ আর একজন পথচারীর সাহায্য নিতে হল। শেষে চারজনে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে নিকোলাসের বাড়ীতে পৌঁছে দরজার পাশেই ঝোলাটি নামিয়ে দিল। নিকোলাস তাঁর সাহায্যকারী পথচারীদের তাঁকে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক-ভাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। তাঁরা পরস্পরকে বড়দিনের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা জানালা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ব্যাপারটি দেখছিলেন। তাঁরা দৌড়ে বাইরে এসে নিকোলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ঝোলাতে আমাদের জন্য এত জিনিস এনেছ যে চারজন লোক লাগল নিয়ে আসার জন্য ?

খুব খুশী মনে তিনি বললেন—তোমরা নিজেরাই সব দেখ। এর মধ্যে আছে বাদাম, মিষ্টিখাবার, কেক, আপেল, নাসপাতি, খেলনা

ইত্যাদি। ছেলেমেয়েরা ঝোলা খুলে দেখল বাদাম, কেক, মিষ্টিখাবার, খেলনা সবরকম আছে ; সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে আপেল ও নাসপাতিগুলো সব সোনা ও রূপার টাকা হয়ে গেছে।

এই দেখে তারা এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তাদের কারুর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছিল না। একটু পরেই তারা আনন্দে ও হাসিতে ফেটে পড়ল।

নিকোলাস ধীরে ধীরে কাউণ্ট গুডফ্রেণ্ডের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া এবং সব ঘটনাই তাঁদের বললেন এবং শেষে বললেন যে তিনি বলে দিয়েছেন যে এই উপহারগুলি যেন উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়। তিনি বললেন—আমাদের যদি এই সৌভাগ্য বজায় রাখতে হয়, এই উপহারগুলি থেকে যদি আমরা ঐশ্বর্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশীর্বাদ পেতে চাই, তাহলে প্রথমেই আমাদের চেয়ে কম ভাগ্যবান-দের ডেকে তাদের কিছুটা আনন্দ দিতে হবে। অন্যদেরও আনন্দের ভাগ দেওয়া হবে শুনে ছেলেমেয়েরা খুব খুশী হল এবং তারা কুড়িজন গরীব ছেলেমেয়ে খুঁজে আনল। বড়দিনের দিন তাদের এমন ভাল করে ভোজ খাওয়ান হল যা তারা সারাজীবন মনে রাখবে।

নিকোলাস তাঁর পরীর-দেওয়া উপহারগুলি খুব ভেবেচিন্তে এবং সহৃদয়তার সঙ্গেই ব্যবহার করেছিলেন। মোজা বোনার কাজে তিনি প্রথমেই খুব খ্যাতি অর্জন করলেন, তারপরে একজন ধনী ব্যবসায়ী হলেন এবং শেষকালে তিনি তাঁদের সহরের মেয়র হলেন। তাঁর এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি গরীবদের কথা এবং তাঁদের সাহায্য করার কথা কখনও ভোলেন নি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং নাতি-নাতনীরা সর্বদাই পরস্পরের প্রতি সহৃদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন এবং যাঁরা গরীব ও সৎ লোক, যাঁদের কাউণ্ট চার্লস গুডফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ লাভের সৌভাগ্য হয়নি, এমন সব লোকদের সর্বদাই আগ্রহের সঙ্গে সাহায্য করতেন।

চ্যাঙ ফেঙ

নানইয়াং প্রদেশের বাসিন্দা চ্যাঙ ফেঙ একদিন তাঁর দেশের দক্ষিণ উপকূলের ধারে পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে গেলেন। তাঁর চাকরকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেখানে যাবার পথে ফুকিয়েন প্রদেশের ফুটাং সিয়েনে পৌঁছে হুংসাং গ্রামের কাছে একটি সরাই-খানায় তিনি আশ্রয় নিলেন। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থেমেছে এবং সূর্যাস্তের গোলাপী আভা নীল পাহাড়ের চূড়াগুলির ওপর সুন্দর দেখাচ্ছিল। গ্রামের ছোট ছোট বাড়ী ও নানা ধরনের গাছপালার পাশ দিয়ে ছোট ছোট নদী তরতর করে বয়ে যাচ্ছিল।

এই সুন্দর দৃশ্য দেখে চ্যাঙ হাতে একটি বেতের ছড়ি নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কতদূর চলে গিয়েছিলেন, নিজেই বুঝতে পারেন নি। তিনি দেখলেন যে তিনি একটি সুন্দর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর মনে হল ওখানে যেন একটি বিরাট সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো রয়েছে। ওই তৃণভূমির শেষের দিকে একটি ছোট গাছ ছিল। অনেকটা হেঁটে এসে চ্যাঙের একটু গরম লাগছিল, তাই তিনি গায়ের গাউনটি খুলে একটি ডালে টাঙ্গিয়ে দিলেন এবং তাঁর বেতের ছড়িটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি একটু বিশ্রাম নেবার জন্য ওই সুন্দর তৃণভূমিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। দক্ষিণ দিক থেকে যে হাওয়া আসছিল, তা তাঁর খুব ভাল লাগছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মনে হল ভারী কোন জন্তু তাঁর শরীরের ওপরে উঠেছে। ধড়মড় করে তিনি উঠে বসলেন। এতক্ষণে তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে এবং শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য—তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি নিজের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁর গায়ে ডোরা ডোরা দাগ এবং সারা শরীর লোমে ভরে গেছে। তিনি একটি বাঘে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। বিস্মিত হলেও তিনি অসন্তুষ্ট হলেন না। তিনি নিজের মনে মনেই বললেন যে সিংহের মত বাঘও ত পশুদের রাজা বলে গণ্য হয়। তীক্ষ্ণ থাবা এবং অসম্ভব শক্তি নিয়ে তিনি এখন পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। কেউ তাঁর কিছু করতে পারবে না।

গভীর আনন্দে তিনি ক্ষিপ্রগতিতে পাহাড়ের ওপর উঠে আবার নেমে এসে তাঁর পায়ের জোর পরীক্ষা করলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন তাঁর ক্ষিদে পাচ্ছিল। তিনি কিছু খাদ্যবস্তুর সন্ধানে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন। কে আর তাঁকে খাবার দেবে? তাকে দেখেই ত ছোট ছোট জন্তুরা সব যে যেদিকে পারল পালিয়ে যেতে লাগল। তিনি নিজের মনেই বললেন—এ আবার কি? আমাকে দেখেই এত ভয়! আমি এত খারাপ নয়। যদিও আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, তবুও আমার এইসব ছোট প্রাণীদের খেয়ে ফেলবার কোন ইচ্ছা নেই।

খুব বেশী ক্ষিদে পাওয়ায় তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল সিয়েন সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার চেঙ চেউকে আজ খেয়ে ফেলব। তখন তিনি পথের ধারে তাঁর শিকারকে ধরবার জন্য গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণ দিক থেকে একজন লোক এল। সে একজন পথচারীকে থামিয়ে বলল—আমি ফুচৌ থেকে আসছি। আমাদের পদস্থ অফিসার আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমাকে

পাঠান হয়েছে। এতক্ষণে তাঁর প্রায় এসে যাবার কথা। তুমি কি তাঁকে দেখেছ বা শুনেছ তিনি আসছেন কি না?

পথচারী উত্তরে বলল—তিনি আমার কর্তা। আমি যখন রওনা হই তখন তিনি বেরোবার জন্য জামাকাপড় পরছিলেন। যে কোন মুহূর্তেই তিনি এসে পড়বেন।

—তিনি কি একলা আসছেন, না সঙ্গে আরও লোকজন আছে? আর, তিনি কিরকম পোশাক পরে আসছেন তুমি আমাকে একটু বলে রাখ, যাতে আমি তাঁকে চিনতে পারি।

—ওঁরা তিনজন আসছেন। উনি আসছেন ঘন সবুজ রঙের পোশাক পরে।

চ্যাঙ ফেঙ যদিও বাঘে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তিনি মানুষের কথা বুঝতে পারতেন। তিনি ওইসব কথা শুনে বুঝে নিলেন এবং একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থাকলেন।

একটু পরেই সবুজ রঙের পোশাক পরা চেঙ চিউ এসে পড়লেন এবং তাঁর পেছনে কয়েকজন লোকও ছিল। তাঁর চেহারা বেশ সুঠাম এবং মর্যাদাপূর্ণ। তিনি যখন ঐ ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাঘরূপী চ্যাঙ ফেঙ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে কামড়ে ধরে উঁচু পাহাড়ে উঠে গেলেন। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি; তাই যদিও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন লোক ছিল, তাঁরা অন্ধকারে বাঘের পেছনে ছুটতে সাহস পেলেন না। চ্যাঙ ফেঙ মনের আনন্দে ভোজ সারলেন।

তাঁর পেট ভরে যাওয়ায় তিনি আনন্দিত মনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তখন তাঁর মনে হল তিনি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আগের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে এক-সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতেন। এখন পাহাড়ে তাঁকে একলাই খেতে হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাঘ হয়ে আর সুখটা কি হল? বিরক্ত হয়ে তিনি একবার গর্জন করে উঠলেন। তিনি

ভাবছিলেন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে বন্দীজীবন কাটানয় আনন্দ কোথায় ? কোন লোকের পক্ষে বেশী শক্তিশালী এবং ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ভাল নয়—তখন আর বিশেষ কেউ তার কাছে ঘেঁসতে চায় না। আমার মনে হয় তৃণভূমিতে ফিরে যাওয়াই আমার ভাল এবং দেখি যদি আমি আবার মানুষে রূপান্তরিত হতে পারি।

তিনি ধীরে ধীরে তাঁর পরিচিত তৃণভূমির দিকে এগোতে লাগলেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর গাউন গাছের ডালে ঝুলছে এবং বেতের ছড়িটিও গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তখন সেইখানে আগের মত আবার হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর তিনি উঠলেন। আশ্চর্যের বিষয় আবার তিনি মানুষ হয়ে গেছেন।

গাউনটি গায়ে দিয়ে বেতের ছড়িটি হাতে নিয়ে তিনি সরাই-খানায় ফিরে গেলেন। তাঁর ওখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর ইতিমধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

আগের দিন রাত্রে মনিবকে ফিরতে না দেখে তাঁর চাকর চারদিকে খোঁজ খবর করেছে। একজন কেবল বলেছিল যে চ্যাঙ ফেঙকে ছড়ি হাতে বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখেছেন। কিন্তু চাকর তাঁর খোঁজ না পেয়ে খুব ভাবনায় পড়েছিল। এখন তার মনিবকে ফিরে আসতে দেখে সে যেন বাঁচল। সে তাড়াতাড়ি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—কাল রাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

চ্যাঙ ফেঙ তাকে সত্যিকথা বললেন না। তিনি বললেন—ওই সুন্দর পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে আমি একটি বৌদ্ধ মঠ দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। ঐখানে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই ওখানেই রাত্রে থেকে গেলাম।

চাকর তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলল—শোনা যাচ্ছে এখানে খুব বাঘের উপদ্রব আছে। চেঙ চিউ নামে সিয়েন সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে গতকাল ভোর রাত্রে বাঘে নিয়ে গেছে। তাঁর আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেখুন, পাহাড়ের ওপরের দিকেই বাঘেরা থাকে। একলা ওপরের দিকে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। আপনি গতকাল রাত্রে ফিরে না আসাতে আমি খুব চিন্তায় পড়েছিলাম। ভাগ্য ভাল যে আপনি নিরাপদে ফিরে এসেছেন।

চ্যাঙ ফেঙ তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

কয়েক বছর পরে চ্যাঙ ফেঙ একবার হুইয়াং সহরে বেড়াতে গেলেন এবং একটি হোষ্টেলে উঠলেন। হোষ্টেলের কর্তা তাঁকে রাত্রে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ঐ ভোজসভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে অতিথিদের প্রত্যেককেই নিজের জীবনের অদ্ভূত কোন ঘটনার একটি করে গল্প বলতে হবে।

চ্যাঙ ফেঙের যখন গল্প বলার সময় এল তখন তিনি কি করে বাঘে রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং একটি মানুষকে খেয়ে ফেলেছিলেন তার ঘটনা সবিস্তারে বললেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর গল্পটি শুনে সকলে উত্তেজিত হয়ে হাসিতে ফেটে পড়বেন। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন যুবক হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রেগে তাঁর দিকে গিয়ে একটি ছুরি দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করল। এই যুবকটি হল চেঙ চিউ-এর ছেলে চেঙ সিয়া। সে খাবার টেবিলের আর একদিকে বসেছিল।

চেঙ সিয়া বলল—আমি আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই ; কিন্তু অন্য অতিথিরা তাকে ধরে থামাল। হোষ্টেলের কর্তা যখন দেখলেন যুবককে কিছুতেই নিরস্ত করা যাবে না, তখন তিনি নগরের শাসককে

অনুরোধ করলেন তিনি যেন নৌকোর মাঝিকে হুকুম দেন চেঙ সিয়াকে হুই নদীর অপর পারে পৌঁছে দিতে এবং ওকে যেন আর ফিরিয়ে না



নিয়ে আসে। বন্ধুরা চ্যাঙ ফেঙকেও উপদেশ দিলেন—তুমিও পশ্চিমের দিকে কোথাও চলে যাও এবং তোমার নামটা বদলে ফেল।

শয়তানের সুন্দরী মেয়ে

অনেকদিন আগে একজন বুড়ো লোক একটি সুন্দর বাড়ীতে বসবাস করত। তার অনেক জমিজমাও ছিল। কিছু লোক ভাবত লোকটি 'শয়তান' এবং তার আড়ালে তারা তাকে 'শয়তান' বলত। অনেক দূর দূরের বাসিন্দা তরুণ যুবকেরা তার কাছে কাজ করতে চাইত ; কারণ তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। তার নাম রুথী-মা-টুথী। বুড়ো শয়তানের কাছে যে আসত তাকে সে কাজে নিত ; কিন্তু তাদের খাটিয়ে মারত। তারা কেউই রুথীর কাছে বিশেষ ঘেঁসতে পারত না। কেউ কিছু বললে রুথী হেসে উড়িয়ে দিত।

একটি ছেলে সাত বছর ধরে ওখানে কাজ করছিল। তার নাম আল্‌ফ নাইট। সে পরিহাস করে রুথীকে তার সঙ্গে চলে যাবার জন্য প্রায়ই উত্যক্ত করত। রুথী বলত—তুমি চুপ কর। কেননা ওদের বাড়ীর পোষা কালো মোরগটি কথা বলতে পারত এবং সে যা যা শুনছে বা দেখছে সবই শয়তানকে বলবে। এই শুনে তারপর থেকে আল্‌ফ ওই মোরগটি যেখানে থাকত, সেখানে যেত না ; কিন্তু সে রুথীকে উত্যক্ত করতে ছাড়ত না।

শেষ পর্যন্ত একদিন রুথী দুটি ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে তৈরী হল এবং কালো মোরগটিকে কিছু দানাপানি দিয়ে দিল। আল্‌ফ ধরে নিয়েছিল শয়তান ঐ সময় একটু বিশ্রাম নিচ্ছে ; কিন্তু রুথী তা ভাল করেই জানত। সুতরাং তারা এই ফাঁকে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল।

কিছুদূর যাবার পর তারা পিছন ফিরে দেখল যে শয়তান তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে। মনে হল এই বোধহয় শয়তান তাদের ধরে ফেলল। রুথী-মা-টুথী তার থলি থেকে এক বোতল জল বার করে আল্‌ফকে দিয়ে বলল—আমাদের পেছনের দিকের রাস্তায় জলটা



ছুঁড়ে দাও। আল্‌ফ জলটি ঢেলে দিল। ঐ জল মিনিটে একমাইল করে বেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সারা দেশটা জলে ভর্তি হয়ে গেল। জলের স্রোতে বড় বড় ধানের গোলা ভাসতে লাগল এবং ছোট ছোট সব মুরগী খড়ের গাদার ওপর ভেসে যেতে লাগল। বুড়ো শয়তান এই জল ডিঙিয়ে যেতে পারল না। তাকে এই জল পার হতে তিন হাজার মাইল রাস্তা ঘুরে যেতে হল।

আল্‌ফ ও রুথী ঘোড়ায় চড়ে এগিয়েই চলেছে। পরের দিন বিকেলে তারা আবার পেছন ফিরে দেখতে পেল বুড়ো শয়তান এগিয়ে

আসছে। এবার সে অবশ্য আগের চেয়ে একটু আস্তে আসছিল। তবু মনে হল যাইহোক না কেন সে এখনই হোক বা একটু পরেই হোক তাদের ধরে ফেলবে। এবার রুথী তার পকেট থেকে একটি বাইবেল বার করে আল্‌ফকে দিয়ে বলল—আমাদের পেছনের রাস্তায় এটি ছুঁড়ে ফেলে দাও। আল্‌ফ তার কথামত তাই করল। দেখতে দেখতে বাইবেলটি অসংখ্য বাইবেল হয়ে মিনিটে এক মাইল করে বেড়ে যেতে লাগল এবং পুণ্য কথায় লেখা ভর্তি কাগজে সারা দেশ ভরে গেল। শয়তান বাইবেল সহ্য করতে পারে না, সকলেই জানে। তখন আর কিছু করতে না পেরে শয়তান শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে গেল।

আল্‌ফ ও রুথী এবার আরও জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা পেছন ফিরে দেখল বুড়ো শয়তান তার বড় কালো ঘোড়ায় চড়ে আসছে। এবারেও মনে হল শয়তান শীগগিরই তাদের কাছে এসে পড়বে এবং তাদের ধরে ফেলবে। রুথী তখনই তার থলি থেকে একটি কাঁটা গাছের ডাল বার করে আল্‌ফের হাতে দিয়ে বলল—আমাদের পেছনের রাস্তায় এটি ছুঁড়ে ফেলে দাও। আল্‌ফ তাই করল। দেখতে দেখতে মাইলের পর মাইল জায়গা কাঁটা গাছে ভর্তি হয়ে গেল। গাছগুলি বেড়ে খুব উঁচু উঁচুও হয়ে উঠল। ওই কাঁটা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে আসতে বুড়ো শয়তানের হাজার মাইল ঘুরে যেতে হল।

আল্‌ফ আর রুথী ঘোড়া ছুটিয়ে আবার এগিয়ে চলল। অনেকটা যাবার পর আবার ওরা পেছনে ফিরে দেখল যে শয়তান তখনও ওদের ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে। মনে হল এবার সে ঠিক ওদের ধরে ফেলবে। রুথী তখন তার পকেট থেকে তিনটি ছোট নুড়ি বার করে আল্‌ফকে দিয়ে বলল—এগুলো আমাদের পেছনের রাস্তায় ছুঁড়ে দাও। আল্‌ফ পাথর নুড়ি তিনটি পেছন দিকে ছুঁড়ে দিল। নুড়িগুলোও এক মিনিটে এক মাইল জায়গা জুড়ে বাড়তে

বাড়তে সারা দেশ জুড়ে আল্‌গা পাথরের নুড়ি এবং পঞ্চাশ ফুট উঁচু চোরাবালিতে ভরে গেল। অবস্থা এমন হল যে তাদের ধরতে গেলে শয়তানকে এবার আরও দু'হাজার মাইল ঘুরে যেতে হবে।

আল্‌ফ ও রুথী আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে আল্‌ফের আত্মীয়র বাড়ী গিয়ে পৌঁছে গেল। ওখানে রুথীকে সকলেরই খুব ভাল লাগল। ওরা রাত্রির খাওয়াদাওয়া সেরে নিল। পরের দিন পুরুত মশাই এলেন এবং ওদের বিয়ে দিলেন। রুথী ঘর সংসারের কাজ-কর্মে মন দিল। ওরা শয়তানের হাত থেকে রেহাই পেল এবং সুখে দিন কাটাতে লাগল।

চালাক ছেলে

এক সময় এক বোকা ভদ্রমহিলা এক গ্রামে বাস করতেন। তাঁর দুই ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে এক ছেলে মারা গিয়েছিল ; আর একজন মার সঙ্গে বসবাস করত।

একদিন যখন তাঁর ছেলে বাড়ীতে ছিল না এমন সময় একজন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত সৈনিক তাঁদের বাড়ীর দরজায় ডাকাডাকি করায় মহিলাটি দরজা খুললেন। সৈনিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি রাত্রিতে এখানে থাকতে পারি ?

মহিলা উত্তর দিলেন—আমাদের ত আলাদা ঘর নেই।

সৈনিক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি আমাকে কিছু খাবার এবং একটু জল দিতে পারেন ?

মহিলা উত্তরে বললেন—আমাদের বাড়ীতে ত এখন কিছুই নেই।

সৈনিকটি আর কি করেন ? নিরাশ হয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

উত্তরে তিনি বললেন—আমি অপর জগত থেকে আসছি।

মহিলাটি বললেন— আপনি এতক্ষণ বলেন নি কেন ? আমার এক ছেলে ত সেখানে আছে। তার সঙ্গে কি আপনার কোন সময় দেখা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমরা ত একই ঘরে বাস করতাম। সে

ত এখন একদল সারস পাখীর দেখাশোনা করছে। সারসরা মিষ্টি কাঁটা গোলাপের বনের মধ্যে ঢুকে যায়, আর তাদের সামলাতে ও বেচারার কাপড়জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এই শুনে মহিলাটি বললেন—আমার কাছে কিছু জামার কাপড় আছে। আপনি কি তাকে সেটি দিতে পারবেন ?

—আনন্দের সঙ্গে দিয়ে দেব।

মহিলাটি এই কথা শুনে জামার কাপড়টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং সৈনিক সেটি নিয়ে চলে গেলেন।

বিকেলের দিকে ওঁর ছেলে মাঠ থেকে ফিরে এল। তিনি তখন তাঁকে ঐ সৈনিকের কথা বললেন।

ছেলে এই শুনে বলল—আমি তাহলে এবার পৃথিবীটা ঘুরে দেখে আসি। যদি তোমার চেয়েও বোকা লোক দেখতে পাই, তাহলে আমি ফিরে আসব এবং আজীবন তোমার দেখাশুনা করব ; কিন্তু তা যদি না পাই আমি আর ফিরে আসব না। এই বলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে সে এক জমিদারের খামারে গিয়ে ঢুকল। সেখানে একটি শূকরী ছিল। শূকরীটির সামনে হাঁটুগেড়ে বসে সে মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন জানাতে সুরু করল। খামারের কর্ত্রী দূর থেকে এই দেখে আর হেসে বাঁচেন না। তিনি চেঁচিয়ে একজন দাসীকে ডেকে বললেন—মাসেঙ্কা, গিয়ে দেখ ত ওই লোকটি শূকরীকে ওরকম নীচু হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে কেন ?

মাসেঙ্কা গিয়ে তরুণ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করল—তুমি হাঁটু গেড়ে ওই শূকরীকে অভিবাদন জানাচ্ছ কেন ?

উত্তরে ছেলেটি বলল—তোমার কর্ত্রীকে গিয়ে বল যে তোমাদের গায়ে-দাগওলা শূকরীটি আমাদের শূকরীর বোন। তার কাল বিয়ে হবে। তিনি কি দয়া করে ঐ উপলক্ষে শূকরীটিকে আর ওর বাচ্ছাদের নিয়ে যেতে দেবেন ? বাচ্ছারা তাহলে নিতকনে হবে।

মাসেঙ্কা গিয়ে তার কর্ত্রীকে বলল এবং এই কথা শুনে তিনি ত আর হাসি থামাতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন—ঠিক আছে। ওকে নিয়ে লোকে একটু হাসাহাসি করুক। তুমি এক কাজ কর—আমার টুপিটি শূকরীর মাথায় পরিয়ে দাও, আর সহিসকে বল ঘোড়ায় টানা গাড়ীটিতে দুটি ঘোড়া লাগিয়ে দিক।

শূকরীকে আর তার বাচ্চাদের সাজিয়ে ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়া হল এবং গাড়ীর লাগামটি আগন্তুক তরুণের হাতে দিয়ে দেওয়া হল। সে গাড়ীটি হাঁকিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে খামারের কর্তা বাড়ী ফিরে এলেন। তিনি আসতেই কর্ত্রী তাঁকে বললেন—কি মজার ব্যাপারই না হল! তুমি ত আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। একজন তরুণ এসে আমাদের শূকরীর সামনে হাঁটু গেড়ে নীচু হয়ে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছিল। সে বলল যে আমাদের দাগওলা শূকরী ওদের শূকরীর বোন—কাল তার বিয়ে, তাই সে ওকে এবং বাচ্চাদের নিতকনে করার জন্য নিয়ে যাবে বলে আমার অনুমতি চেয়েছিল।

কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ওদের যেতে দিলে?

উত্তরে কর্ত্রী বললেন—হ্যাঁ। আর আমাদের ঘোড়ায় টানা গাড়ীও দুটি ঘোড়া সমেত নিয়ে গেল।

কর্তা বললেন—আমি দেখছি সেই লোকটি মোটেই বোকা নয় এবং তুমিও বুদ্ধিমতী নও।

তাঁর স্ত্রীকে বোকা বানানো হয়েছে বলে কর্তা রেগে গিয়েছিলেন। তিনি দৌড়ে আস্তাবলে গিয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেলেন সেই তরুণকে ধরবার জন্য।

পেছনে দ্রুতবেগে একটি ঘোড়া ছুটে আসছে এই শব্দ শুনতে পেয়ে তরুণটি তার গাড়ীটিকে ঘন বনের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে গেল এবং সেখানে রেখে দিল। তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে একটি গাছের শুকনো ডালের ওপর বসিয়ে দিয়ে তারপর ঐ ঘন বনের ধারে গিয়ে বসল।

কর্তা ঐখান দিয়ে যাবার সময় তাকে বসে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ওহে দাড়িওলা মানুষ ; তুমি কি একজোড়া ঘোড়া নিয়ে একটি গাড়ীকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ ? গাড়ীতে একটি শূকরী ও তার বাচ্ছারা ছিল ?

তরুণ উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমি দেখেছি। তবে সে ত বেশ কিছুক্ষণ আগে।

কর্তা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কোন দিকে গেছে বল ত ? তাকে ধরি কি করে ?

তরুণ বলল—আপনি ধরতে পারেন ; কিন্তু আপনি বোধ হয় রাস্তা হারিয়ে ফেলবেন।

কর্তা ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি তরুণটিকে বললেন—তুমি আমাকে একটু অনুগ্রহ করবে ? তুমি ঘোড়াটি নিয়ে রওনা হয়ে যাও এবং তাকে এখানে ধরে নিয়ে এস।

তরুণটি উত্তরে বলল—আমি দুঃখিত কর্তা, আমি ত এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না। আমার টুপির নীচে এক প্রভুর ঈগল পাখীকে জালে ধরে রাখা আছে।

কর্তা বললেন—তুমি এগিয়ে যাও ত ; আমি তোমার ঈগলের দিকে লক্ষ্য রাখব।

—তা হয় না কর্তা। আপনি যদি ওটিকে পালিয়ে যেতে দেন। পাখীটি মূল্যবান। ওটি যদি আবার চলে যায় তাহলে প্রভু আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।

—ওটির দাম কত হবে ?

—আমার মনে হয় তিন শ রুব্‌ল (রাশিয়ান মুদ্রা) হবে।

—ঠিক আছে। যদি পাখীটি পালিয়ে যায়, তাহলে আমি তোমাকে তিন শ রুব্‌ল দিয়ে দেব। তাহলে হবে ত ?

—ওটা ত কথার কথা হল। আপনি যে কথার খেলাপ করবেন না সে বিষয়ে আমি কি করে নিশ্চিত হব ?

—ওঃ তাহলে দেখছি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। এই নাও তিন শ রুব্‌ল। যাও এখন গিয়ে সেই হতভাগাকে ধরে নিয়ে এস।

ছেলেটি মুদ্রাগুলি নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার উপর চড়ে বসে ঘন বনের মধ্যে ঢুকে গেল। কর্তা তখন ওই বনের ধারে বসে খালি টুপিটির দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল ক্রমশঃ সূর্য অস্ত যাচ্ছিল ; কিন্তু ওই ছেলেটির তখনও পাত্তা নেই। কর্তা চিন্তায় পড়লেন, এখন কি করা যায় ? হঠাৎ তাঁর মনে হল কি রকম ঈগল একবার দেখাই যাক না। এই ভেবে তিনি টুপিটা তুলে দেখলেন তার তলায় একটা গাছের বাজে শুকনো ডাল পড়ে রয়েছে। ঈগলের কোন চিহ্নই নেই। বিরক্ত হয়ে তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন।

তিনি মনে মনে ভাবলেন লোকটি একটি আসল জোচ্চোর ; অথবা এমনও হতে পারে, ওই লোকটিই আমার স্ত্রীকে বোকা বানিয়েছে। তিনি বিরক্ত হয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন এবং বেশ দেরীতে রাত্রে বাড়ী পৌছলেন। তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি হেসে বললেন—যতই হোক, তোমার শূকরী ত আমারও। তাই আমি আর তোমার বোকামীর জন্য তোমাকে ভর্ৎসনা করব না। বোনের বিয়েতে শূকরী তার বাচ্ছাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করুক।

অনেক আগেই তরুণ ছেলেটি বাড়ী পৌছে গেল এবং তার মাকে বলল—তোমার যদি এক শ বছর বয়স পেরিয়েও যায় তাহলেও তুমি আমার সঙ্গেই থাকতে পারবে। খামার বাড়ীতেই দেখে এলাম তোমার চেয়ে বোকা লোকও রয়েছে। বিনা কারণেই তারা আমাকে নগদ তিন শ রুব্‌ল, তিনটি ঘোড়া, একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ী, একটি শূকরী ও তার বাচ্ছাদের দিয়ে দিল।

তিন ভালুকের গল্প

এক সময়ে এক বনে তিনটি ভালুক (ভল্লুক) তাদের নিজেদের বাড়ীতে একসঙ্গে বাস করত। তাদের মধ্যে একটি ছিল খুব ছোট, একটি মাঝারি আকারের, আর একটি বিরাট আকারের ভালুক। ঐ বাড়ীতে তাদের তিনজনেরই নিজেদের আসবাবপত্র, বাসনকোসন সব ছিল। প্রত্যেকেরই পরিজ (পুডিং জাতীয় খাবার) এর জন্যে আলাদা বাটি ছিল—ছোটটির জন্য ছোট বাটি, মাঝারির জন্য মাঝারি বাটি এবং বড়র জন্য বড় বাটি। তাদের প্রত্যেকের বসার জন্য একটি করে চেয়ার ছিল—ছোটটির জন্য ছোট, মাঝারির জন্য মাঝারি এবং বড়র জন্য বড় চেয়ার। তাদের ঘুমোবার জন্য আলাদা আলাদা বিছানা ছিল—ছোটটির জন্য ছোট বিছানা, মাঝারির জন্য মাঝারি বিছানা এবং বড়র জন্য বড় বিছানা।

একদিন সকালে তারা জলযোগের জন্য পরিজ তৈরি করে ঠাণ্ডা হবার জন্য যার যার বাটিতে ঢেলে রেখে বনের মধ্যে একটু ঘুরে আসতে গেল। ওরা বাইরে বেরিয়ে গেলে ছোটখাট এক বৃদ্ধা মহিলা ওদের বাড়ীতে এল। মহিলাটি ছিল অসৎ। প্রথমে সে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে কেউ আছে কিনা দেখল। তারপর চাবির গর্ত দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরেও কাউকে দেখতে না পেয়ে ছিটকিনিটি খুলে ফেলল। ভালুকগুলি ভাল ছিল ; তারা কখনও কারুর ক্ষতি করেনি এবং কখনও সন্দেহ করেনি যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি

করবে। তাই তারা খুব ভাল করে দরজা বন্ধ করে বেরোয়নি। ওই বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল যে টেবিলে তিনটি বাটিতে পরিজ রয়েছে। এই দেখে সে ত খুব খুশী। মহিলা যদি সৎ হত, তাহলে সে ভালুকরা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করত। ভালুকরা ফিরে এসে অতিথিকে দেখলে হয়ত ওকে ওদের সঙ্গে জলযোগ করতে বলত। কিন্তু তার আর তর সইল না; নিজেই নিয়ে পরিজ খেতে আরম্ভ করল। মহিলাটি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির এবং অভদ্র।

প্রথমে সে বড় বাটির পরিজ খেতে গিয়ে দেখল যে খুব গরম। সে খেতে পারল না এবং রেগে গেল। মাঝারি বাটি থেকে খেতে গিয়ে দেখল যে খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওটি তার মোটেই ভাল লাগল না। ছোট ভালুকের জন্য যে পরিজ ছিল, তা খেয়ে দেখল যে ওটি ঠিক আছে—খুব গরমও নয়, খুব ঠাণ্ডাও নয়। ওটি তার খুব ভাল লাগল এবং সে চেটেপুটে সবটা খেয়ে ফেলল। কিন্তু অল্প খেয়ে তার তৃপ্তি হল না; সে রেগে যা-তা বলল।

তারপর মহিলাটি বড় ভালুকের সবচেয়ে বড় চেয়ারে বসল। বসে দেখল যে চেয়ারটি তার পক্ষে খুব শক্ত। উঠে পড়ে সে মাঝারি চেয়ারে বসে দেখল যে সেটি খুব নরম। শেষে সে ছোট ভালুকের চেয়ারে বসে দেখল যে ওটি খুব শক্তও নয়, খুব নরমও নয়। সে ওটিতেই বসল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ভারে চেয়ারের মাঝখানটি ভেঙ্গে তাকে সুদ্ধ নিয়ে মাটিতে বসে গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরের তলায় উঠে গেল।

ওপরে ছিল ভালুকদের শোবার ঘর। ওই ঘরে তিনজনেরই বিছানা ছিল। প্রথমে সে বড় ভালুকের বিছানায় শুল; কিন্তু বিছানার মাথার দিকটা খুব উঁচু ছিল। সেখান থেকে নেমে সে মাঝারি ভালুকের বিছানায় শু'ল; কিন্তু দেখল যে ওই বিছানার

পায়ের দিকটা তার পক্ষে বেশ উঁচু। শেষে সে ছোট ভালুকের বিছানায় শুয়ে দেখল যে ওর মাথা বা পায়ের কোন দিকই বেশী উঁচু নয়। তাই সে ওই বিছানাতেই মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।



কিছুক্ষণ বেড়িয়ে ভালুকরা ভাবল যে পোরিজ এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েছে; তাই তারা খাবার জন্য বাড়ী ফিরে এল। বৃদ্ধা মহিলাটি বড় ভালুকের খাবার চামচটি বড় বাটির ভেতরেই রেখে দিয়েছিল। সেই দেখে কর্কশ কণ্ঠে বড় ভালুক বলল—কেউ আমার

পোরিজ খাচ্ছিল। মাঝারি ভালুকও দেখল যে তার চামচ তার বাটির মধ্যে রয়েছে। চামচগুলো কাঠের ছিল; না হলে রূপার চামচ যদি হত, তাহলে ওই দুষ্টু মহিলাটি চামচগুলো তার জামার পকেটেই পুরে নিত।

মাঝারি ভালুক বলল—আমার পরিজও কেউ খাচ্ছিল।

ছোট ভালুক তখন তার বাটির দিকে তাকিয়ে দেখল যে তার ছোট চামচটি তার বাটির ভেতরে রয়েছে; কিন্তু পোরিজ নেই। সে বলল—আমার পোরিজও কেউ খাচ্ছিল এবং সবটাই খেয়ে ফেলেছে।

এইসব দেখেশুনে তিন ভালুক বুঝল যে কেউ তাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই ঢুকেছে এবং ছোট ভালুকের জলখাবারটা সব খেয়ে ফেলেছে। তখন তারা চারিদিকে খুঁজতে লাগল। বৃদ্ধা মহিলাটি বড় ভালুকের চেয়ারে বসে উঠে পড়ে ওর শক্ত গদিটা আর ঠিকমত রাখেনি। ওই দেখে বড় ভালুক কর্কশকণ্ঠে বলল—কেউ আমার চেয়ারে বসেছিল। মহিলাটি মাঝারি ভালুকের চেয়ারের নরম গদিটি মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। সেই দেখে মাঝারি ভালুক বলল—আমার চেয়ারেও কেউ বসেছিল। ছোট ভালুক তার চেয়ারের অবস্থা দেখে বলল—আমার চেয়ারে কেউ বসেছিল এবং একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

তখন তারা ভাবল যে কাউকে যখন এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না; তখন ওপরের তলায় গিয়ে খুঁজে দেখা দরকার। তারা ওপরে শোবার ঘরে এসে দেখতে লাগল। মহিলাটি বড় ভালুকের বিছানার বালিশটি টেনে অন্য জায়গায় রেখেছিল। ওই দেখে বড় ভালুক বলল—আমার বিছানায় কেউ শুয়েছিল। মহিলাটি মাঝারি ভালুকের বিছানার পাশ বালিশটিও এদিক ওদিক করে রেখেছিল। সে বলল—আমার বিছানাতেও কেউ শুয়েছিল। ছোট ভালুক তার বিছানায় তাকিয়ে দেখল যে তার বিছানার মাথার বালিশ ও পাশ বালিশ ঠিক জায়গায়ই আছে। তার মাথার বালিশের ওপর ওই মহিলার নোংরা কুৎসিৎ মাথাটি দেখা গেল।

ছোট ভালুক বলল—আমার বিছানায় কেউ শুয়ে ছিল এবং এই যে এখনও শুয়ে আছে।

মহিলাটি ঘুমের মধ্যেই বড় ভালুকের ভারী গলার কর্কশ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল ; কিন্তু গভীর ঘুমের জন্য তার মনে হয়েছিল জোরে মেঘ ডাকছে। মাঝারি ভালুকের গলার আওয়াজও সে শুনতে পেয়েছিল—তখন তার মনে হয়েছিল স্বপ্নে কেউ যেন কথা বলছে।

কিন্তু পুঁচকে ছোট ভালুকের গলার আওয়াজ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে তার কথা শুনে সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। উঠেই যখন সে দেখল যে বিছানার এক ধারে তিনটি ভালুক দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে বিছানার অন্যধারে লাফিয়ে পড়েই জানলার দিকে দৌড়ে গেল। জানলা খোলাই ছিল; কেননা সকালে ঘুম থেকে উঠে ভালুকরা শোবার ঘরের জানলা খুলে দিত। সেই খোলা জানলা দিয়ে মহিলাটি বাইরে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু পড়ে তার হাত পা ভাঙ্গল কিনা বা সে দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল বা অন্যকিছু হল, কেউ বলতে পারেনা। ভালুকরা আর কোনদিন তাকে দেখতে পায়নি।

কুমীর জামাই

অনেকদিন আগে নদীর ধারে এক গ্রামে একটি চাষী পরিবার বাস করত। সেই চাষীভাই-এর অনেকটা জমি ছিল। বেশীর ভাগ জমিতে সে গমের চাষ করত। একদিন সকালে সে তার জমিতে গিয়ে দেখল যে তার কচি কচি গমের গাছগুলি কে বা কারা যেন সব মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। এই দেখে তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে গম ক্ষেতের আরও ভেতরে গিয়ে দেখতে পেল যে ঐ শস্যক্ষেতে অনেকগুলি বড় কুমীর আলস্যভরে শুয়ে আছে। তার অত্যন্ত রাগ হল। সে কুমীরদের বলল—তোমরা আমার সব শস্য নষ্ট করেছ। তোমরা তাড়াতাড়ি নদীতে ফিরে যাও। তারা ঐ শুনে একটুও নড়ল না, কেবল একটু হাসল।

এরকম পরপর ক'দিন হল। রোজই ওই চাষীভাই তার গমক্ষেতে গিয়ে দেখে কুমীররা শুয়ে আছে। একদিন তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। তার কথায় কুমীররা কেউ নড়ছে না দেখে সে তাদের গায়ে পাথরের টুকরা ছুঁড়তে লাগল। কুমীররা রেগে ভয়ংকরভাবে তার দিকে তেড়ে এল। তখন সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাদের বলল—তোমরা আমার কোন ক্ষতি কোর না।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুমীরটি বলল—তোমরা যদি আমাদের রাজার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার বা তোমার কচি গম গাছগুলির কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু তা যদি না

দাও, তবে আমাদের গায়ে পাথর ছোঁড়ার জন্য তোমাকে আমরা খেয়ে ফেলব।



অন্য কিছু না ভেবে, নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য কুমীরদের সে কথা দিল—আচ্ছা তাই হবে। বাড়ী ফিরে চাষীভাই যখন তার বৌকে একথা জানাল তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হল; কারণ তাদের

মেয়ে ছিল চাঁদের মতই সুন্দর এবং ইতিমধ্যেই একটি ধনী পরিবারের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার বৌ তাকে বোঝাল—কুমীরদের তুমি যে কথা দিয়েছ ওকথা ভুলে গিয়ে তুমি মেয়ের বিয়ের সব তোড়জোড় কর। যখন বিয়ের সময় এগিয়ে এল তখন তার সঙ্গে যে ছেলেটির বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই ছেলেটি মারা গেল। মেয়েটি এত সুন্দরী ছিল যে সঙ্গে সঙ্গে তার বিয়ের আর একটি প্রস্তাব এল ; কিন্তু এই ছেলেটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। নানা বিষয়ে দুর্ভাগ্যজনক সব ঘটনা ঘটতে থাকায় চাষীর বৌ স্বীকার করল যে এইসব ব্যাপারে কুমীরদের নিশ্চয়ই হাত আছে। তার পরামর্শমত চাষী নদীর তীরে গিয়ে কুমীরদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল তার প্রতিজ্ঞা (কথা দেওয়া) থেকে তাকে মুক্ত করে দিতে ; কিন্তু তারা তার কোন কথাই শুনতে রাজী হল না। তারা বলে দিল—তোমার কথামত খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা কর, না হলে ভয়াবহ শাস্তি পাবে। কুমীরদের এই কথা শুনে সে খুব মন খারাপ করে বাড়ী ফিরে এসে বৌকে সব বলল। তার বৌ কিছুতেই তার মেয়েকে কুমীরের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হল না এবং এ ব্যাপারে যথাসাধ্য বাধা দেবে ঠিক করল।

পরের দিনই তাদের সুন্দরী মেয়েটি হঠাৎ পড়ে গেল এবং তার পা ভাঙ্গল। তার মা তখন বলল—কুমীরদের এই দৈত্যরা আমাদের সকলকেই মেরে ফেলবে দেখছি। সুতরাং আমাদের প্রিয় মেয়েটির মৃত্যু চোখের ওপর দেখার চেয়ে ওকে কুমীরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই ভাল।

চাষী তখন নদীর ধারে গিয়ে কুমীরদের বলল—যত তাড়াতাড়ি ভাল মনে কর তোমরা কনেকে আনবার জন্য বিয়ের শোভাযাত্রা পাঠাতে পার।

পরের দিনই একদল মেয়ে-কুমীর সুন্দর জামা কাপড়ে ভর্তি ট্রে নিয়ে এবং কনের নখ ও চুল রং করবার জিনিষপত্র নিয়ে কনের

বাড়ীতে এসে হাজির হল। তাদের আচার ব্যবহার ছিল খুব ভদ্র এবং নম্র এবং তারা সুন্দরভাবে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানগুলি করল। সুন্দরী কনে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলল—মা, তোমরা কি আমাকে নদীতে বিয়ে দিচ্ছ? আমি ত ডুবে যাব?

যথাসময়ে কনেকে নিয়ে যাবার জন্য আর একটি শোভাযাত্রা এসে পৌঁছল। সারা গ্রাম এই বিয়ের ব্যাপারের জাঁকজমক দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। তারা এত মূল্যবান পোষাকে সুসজ্জিত কুমীরের দল আগে কখনও দেখেনি। কুমীররা কেউ বাজনা বাজাচ্ছিল, অন্যদের হাতে ছিল পোষাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি, মিষ্টান্ন ভর্তি ট্রে। এই শোভাযাত্রা দলের মাঝখানে ছিল উজ্জ্বল সোনা ও মণিমুক্তায় সুসজ্জিত কুমীরদের রাজা।

এইরকম জাঁকজমক দেখে সুন্দরী কনে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করল; কিন্তু যখন খুব সুসজ্জিত কনের পাল্‌কীতে তুলে তাকে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে খুব কাঁদছিল। নদীর ধারে পৌঁছে কুমীররা কনেকে পাল্‌কী থেকে নামিয়ে জোর করে জলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে ডুবে যাবার ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যেমনি কনের পা জলেতে লাগল, তখনই নদীর জল দু'পাশে দু'ভাগ হয়ে গেল এবং দু'ধারে জল অনেকটা উঁচু হয়ে গেল। নদীর নীচে পর্যন্ত একটি রাস্তা দেখা গেল। কনের বাবা—চাষীভাই শোভাযাত্রার পেছনে পেছনে নদীর তীর পর্যন্ত এসেছিল। তাকে একলা রেখে কনেকে নিয়ে শোভাযাত্রা নদীর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চাষীভাই এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর বাড়ী ফিরে গেল।

কয়েকমাস কেটে গেল। কুমীরদের আর কোন খবর নেই। নদী দু'ভাগ হয়ে শোভাযাত্রা যে নদীর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল—চাষীভাই-এর এই কথা তার বৌ খোশগল্প বলে মনে করল এবং তাঁদের মেয়ে ডুবে গেছে বলে ধরে নিয়ে সে প্রায়ই কাঁদত।

কুমীরদের রাজা যখন কনেকে নিয়ে নদীর ভেতর যাচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি ইট কনের বাবাকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—আপনি যদি আপনার মেয়েকে কখনও দেখতে চান, তাহলে নদীর ধারে গিয়ে এই ইটটি নদীতে যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে দেবেন এবং দেখবেন কি হয়।

বৌকে কাঁদতে দেখে চাষীভাই-এর এই ইটের কথা মনে পড়ল। সে তখন তাকে বলল—তুমি যখন এত বিচলিত হয়ে পড়েছ, তখন আমি নিজেই গিয়ে দেখে আসব মেয়ে কেমন আছে।

এই বলে সে ইটটি নিয়ে নদীর তীরে গিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে সেটিকে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল। তখনই তার পায়ের কাছ থেকে নদীর জল দু'পাশে সরে গেল এবং নদীর নীচে পর্যন্ত একটি শুকনো রাস্তা দেখা গেল। রাস্তাটি খুব সুন্দর—পরিষ্কার বালি বিছানো এবং দু'ধারে অনেক ফুল। এই দেখে চাষীভাই সেই পথ দিয়ে নেমে গিয়ে দেখল একটি চমৎকার রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের ছাদটি সোনার এবং দেওয়াল থেকে হীরের জ্যোতি চক্চক করছে। প্রাসাদটির চারিদিকে ছিল উঁচু উঁচু গাছ এবং সুন্দর বাগান। একজন প্রহরী ওই প্রাসাদটির দরজায় পাহারা দিচ্ছিল।

প্রহরীকে চাষীভাই জিজ্ঞাসা করল—এটি কার প্রাসাদ?

প্রহরী উত্তর দিল—এটি কুমীরদের রাজার প্রাসাদ।

চাষীভাই এই শুনে মনে মনে ভাবল—আমার মেয়ে তাহলে সুন্দর এই বিরাট প্রাসাদে বাস করে? তার স্বামী যদি এর অর্ধেক সুন্দরও হত!

প্রহরীর দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—আমার মেয়ে কি ভেতরে আছে?

প্রহরী একটু আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—তোমার মেয়ে? সে এখানে কি করবে?

চাষীভাই উত্তরে বললেন—কুমীরদের রাজা তাকে বিয়ে করেছেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এই কথা শুনে প্রহরী জোরে হেসে উঠল এবং বলল—অদ্ভুত গল্প বটে! কি বললে? আমার প্রভু তোমার মেয়েকে বিয়ে করেছে? বলেই আবার সে জোরে হেসে উঠল।

চাষীভাই-এর মেয়ে প্রাসাদের একটি খোলা জানালার ধারে বসে ছিল। তার স্বামী শিকার থেকে ফিরে আসবে, সেজন্য সে অপেক্ষা করছিল। সে অত্যন্ত সুখী হয়েছিল। কারণ, নদীর রাজ্যে কুমীরদের রাজাকে দেখতে সত্যিই রাজপুত্তুরের মত। তিনি কেবল নদীর তীরে যাবার সময় কুমীরের আকার ধারণ করতেন। তাই চাষীভাই-এর মেয়ে এইরকম সুন্দর স্বামী এবং ওই রকম সুন্দর প্রাসাদ পেয়ে এত সুখী হয়েছিল যে তার বাড়ীর কথা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। এখন প্রহরীর সঙ্গে চাষীভাই-এর কথাবার্তা শুনে তার আগের কথা মনে পড়ে গেল এবং তার বাবার গলার স্বর সে বুঝতে পারল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে সে দেখল যে ঐ উজ্জ্বল ঝক্‌মকে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে তার বাবা অতি সাধারণ কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ইচ্ছা হল তখনই দৌড়ে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে; কিন্তু তার স্বামীর কথা অমান্য করার সাহস হল না। তিনি তাঁকে বাইরে বেরোতে এবং কাউকে তাঁর অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকতে দিতে বারণ করে গিয়েছিলেন। তাই আর অন্য উপায় না দেখে সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কেবল বলল—বাবা, আমি এখানে আছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমার স্বামী এলে আমি তাঁকে বলব তোমাকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

মেয়েকে জীবিত অবস্থায় দেখে চাষীভাই-এর আনন্দ আর ধরে না। তার দুর্ধর্ষ স্বামীকে সে যে বেশ ভয় করে এ দেখে সে আশ্চর্য হল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই একদল ঘোড়সওয়ার রাজপ্রাসাদে এসে ঢুকল।

তাদের সকলেরই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝক্‌ঝকে রূপার পাতের অস্ত্রসজ্জা পরা ছিল। তাদের মাঝখানে ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর বীর যোদ্ধা রাজপুত্র—তাঁর মাথার মুকুট থেকে পা পর্যন্ত উজ্জল পোষাকে সজ্জিত ছিল।

চাষীভাই তখন রাজার পায়ের কাছে বসে কেঁদে বলল—হে রাজন্! তুমি আমায় কৃপা কর। আমি একজন গরীব লোক—আমার মেয়েকে কুমীরদের রাজা নিয়ে চলে এসেছে।

রাজা তখন হেসে উত্তর দিলেন—আমিই কুমীরদের রাজা। আপনার মেয়ে খুব ভাল এবং বাধ্য স্ত্রী। তিনি আপনাকে দেখলে খুব খুশী হবেন।

এরপর কয়েকদিন খুব হৈ চৈ, ভুরিভোজ এবং আনন্দের মধ্যেই কেটে গেল। তারপর চাষীভাই একটু অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন আমার মেয়েকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ী যাবার অনুমতি দিন ; তাহলে ওর মা বুঝবে মেয়ে বেশ সুখেই আছে। কুমীরের রাজা বললেন—তা হয় না। বরং আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে এখানে একটি বাড়ী এবং জমি দেব। তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গেই বসবাস করতে পারবেন।

চাষীভাই বলল—আমার স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। পরে ফিরে আসার সময় আবার দরকার হবে বলে সে কয়েকটি ইট সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

তার স্ত্রীকে সে সব বলল। প্রথমে তার স্ত্রী কুমীরের রাজত্বে গিয়ে বাস করতে রাজী হয় নি। সে বলল—আমি মাঝে মাঝে গিয়ে মেয়েকে দেখে আসব। কিন্তু কয়েকবার যাওয়া-আসা করে নদীর রাজত্ব তার খুব ভাল লাগল এবং সে প্রায়ই মেয়েকে দেখার জন্য যাতায়াত আরম্ভ করল। শেষকালে তারা মেয়ে এবং কুমীরের রাজা জামাইয়ের কাছেই কুমীর-রাজ্যে বসবাস করতে থাকল।

সাতটি তারা

অনেকদিন আগের কথা। এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর বিরাট রাজপ্রাসাদ এবং সেই সঙ্গে ছিল সুন্দর বাগান এবং চারদিকে অনেক খোলা জায়গা। সেইখানে একটি লোক এবং তার স্ত্রী বাস করত। লোকটি ছিল মালী। তার কাজ ছিল বাগানটির যত্ন নেওয়া এবং দেখাশোনা করা।

একদিন এক বৌদ্ধ পুরোহিত ওই বাগানে এলেন এবং মালীর বৌ-এর কাছে ভাত খেতে চাইলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে রাত্রিতে তিনি কি ওখানে থাকতে পারেন ?

ওই বৌদ্ধ পুরোহিত একজন সাধারণ বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন না। আসলে তিনি ছিলেন বুদ্ধের রক্ষাকর্তা ভগবান ফ্যা ইন। পৃথিবীতে আসার জন্য তিনি এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

মালী ও তার বৌ তাঁকে তাদের অতিথি হিসাবে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং বলল যে তিনি সানন্দে তাদের সঙ্গে রাত্রে থাকতে পারেন।

মালী ও তার বৌ তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল সকালে তাঁকে ভাতের সঙ্গে কি খেতে দেওয়া হবে। মালীর বৌ বলল—আমাদের মুরগীটিকে মেরে সকালে ওঁর জন্য ভাল তরকারী করে দেব। আমাদের আরও ছটি মুরগীর বাচ্চা ত থাকবে। তারা অবশ্য যদিও এখন খুব ছোট ; কিন্তু ধীরে ধীরে ওরাও ত বড় হয়ে উঠবে।

মালী তাতে আপত্তি করে বলল—না, না। বাচ্চাদের কাছ থেকে তুমি ওদের মাকে কেড়ে নিতে পার না। মাকে ছাড়া ওরা কি করে থাকবে ?

মালীর বৌ বলল—বোকার মত কথা বোল না।

মালী জোর দিয়ে বলল—আমি এ কাজ করব না।

মালীর বৌ উত্তর দিল—ঠিক আছে, তুমি যদি না কর, আমিই করব। পুরোহিত আমাদের অতিথি। কাল সকালে তিনি চলে যাবার আগে আমাদের উচিত তাঁকে ভাল করে খাইয়ে দেওয়া।

মালী ও তার বৌ-এর কথাবার্তা মুরগীটি সব শুনছিল। তাদের সিদ্ধান্ত শোনার পর সে তার ছয় বাচ্চাকে কাছে ডাকল এবং তাদের বলল—কাল থেকে তোমরা আর আমাকে পাবে না। আমাকে মেরে কাল তরকারী রান্না করে পুরোহিতকে ভাতের সঙ্গে খেতে দেওয়া হবে। এখন তোমরা আমাকে কথা দাও যে তোমরা সকলে ভাল আচরণ করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে, তাহলে তোমরা ঠিক থাকতে পারবে।

বাচ্চারা মায়ের এই কথা শুনে কান্না স্মুরু করে দিল। তাদের কান্না আর থামতে চায় না। তারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—আমাদের মাকে যদি মরতে হয়, তাহলে আমরাও মরব। আমরা মাকে ছাড়া বাঁচব না।

পরের দিন সকালে মালীর বৌ খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠল। সে উঠেই একটি পাত্রে জল গরম করতে বসিয়ে দিল। তারপর সে মুরগীদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। মুরগী তখনও তার বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মালীর বৌ চুপি চুপি ওখানে গিয়ে মুরগীটিকে তুলে নিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে মুরগীটিকে মেরে তার মাংস কেটে পরিষ্কার করে নিয়ে গরম জলে ছেড়ে দিল। আর একটি পাত্রে ভাতও চড়িয়ে দিল।

মুরগীটিকে তুলে নিতেই ওর বাচ্চাগুলিও ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল

এবং তারা মালীর বৌ এর পেছন পেছন ঘুরছিল। অসহায়ভাবে তারা দেখল তাদের মাকে মেরে গরম জলের পাত্রে ফেলে দেওয়া হল। তারাও ওই দেখে একে একে উঠে ঐ পাত্রের ভেতরে গিয়ে পড়ল এবং ফুটন্ত গরম জলে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। মার সঙ্গে তারা একসঙ্গেই মৃত্যু বরণ করল।

মালীর বৌ খুব যত্ন করে মুরগীর মাংসের তরকারী রান্না করল পুরোহিতকে ভাতের সঙ্গে খেতে দেবে বলে। পুরোহিত মশাই বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর, অবাক কাণ্ড! তিনি শূন্যে উঠে গেলেন এবং মালীর বৌ এর চোখের সামনে সোজা স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি ত আসলে ভগবান ফ্যা ইন—পৃথিবীতে আসার জন্য তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতের আকার ধারণ করেছিলেন।

এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে মালী ও তার বৌ প্রতিজ্ঞা করল যে তারা আর কখনও মুরগীর মাংস খাবে না। যা থাকবে পুরোহিতদের খাওয়াবার জন্য রেখে দেবে।

ভগবান ফ্যা ইন পৃথিবীতে এলে পরে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা এবং অতিথি হিসাবে আন্তরিকভাবে সেবা করার জন্য মালী ও তার বৌ তাদের সময়মত যখন মারা গেল এবং আবার জন্মগ্রহণ করল, তখন তারা দেবদূত হয়ে জন্মাল এবং স্বর্গেই বসবাস করতে লাগল।

যার মাংস দিয়ে পুরোহিতের আহারের তরকারী রান্না হয়েছিল সেই মা-মুরগী এবং বাচ্চা মুরগী ছ'টি যারা মাকে ছাড়বে না বলে সেই রান্নার পাত্রেই লাফিয়ে পড়েছিল—তারা সাতটি তারা হয়ে জন্মাল এবং তারা আজও নীল আকাশে কাছাকাছি থেকে জ্বলজ্বল করছে।

নির্বাসিত দেবতা

জাপান যখন সবে নতুন দ্বীপপুঞ্জ হয়ে গড়ে উঠছিল, সেই প্রাচীনকালে তারই একটি দ্বীপে এক দেবতা বাস করতেন। প্রচলিত কাহিনীতে জানা যায় যে তাঁর বোন এক দেবী সূর্যে বাস করতেন। তাঁর প্রতি খারাপ আচরণ করার জন্য ওই দেবতা পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই দেবীর নাম ছিল অমা। তাঁদের পিতার মৃত্যুতে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সূর্য। তাঁর দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই পেয়েছিলেন চন্দ্র আর ছোট ভাই পেয়েছিলেন সমুদ্র। ছোট ভাইয়ের নাম ছিল সুসানো। ছোটবেলা থেকে তিনি খুব দুষ্টু ছিলেন এবং সমানে তাঁর বড় ভাই এবং বোন অমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেন। তাঁর দাদা তাঁকে আদর দিয়ে নষ্ট করেছিলেন, কিন্তু তার বোন তাকে ভাল করার চেষ্টা করতেন। তিনি সুসানোকে বলতেন—পৃথিবীর মানুষরা দুষ্টুমি করে এবং ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, দেবতারা করেন না।

সুসানো উত্তরে বলতেন—তাহলে আমি মানুষ হয়ে পৃথিবীতে বাস করলেই ভাল হত।

অমা তাঁকে প্রায়ই বলতেন—বোকা ভাই আমার, তুমি কি জাননা যে যদিও তুমি একজন দেবতা, তবুও তোমার এই বোকার মত ইচ্ছা পূরণ হয়ে যেতে পারে। তখন তাঁর বড় ভাই হাসতেন এবং বলতেন যে ছোটভাইয়ের প্রতি নিষ্ঠুর হোয়ো না। তিনি সুসানোকে বলতেন—দিদিকে তোমার উত্যক্ত করা উচিত নয়।

একদিন অমা তাঁর বড়ভাইকে বললেন—দাদা, সুসানো এখন বড় হয়ে উঠছে। সে ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে যাওয়া-আসা সুরু করে দিয়েছে। এখানে ত সে আমাকে এবং আমার সহচরীদের সমানে বিরক্ত করে। তাই আমার ভয় হয়, পৃথিবীতে গিয়ে সে যে কি করে!

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি ভয় হয় যে পৃথিবীতে আমাদের সুনাম নষ্ট হবে।

অমা উত্তর দিলেন—ঠিক তাই।

দাদা বললেন—তুমি এ নিয়ে বড় বেশী চিন্তা কর। পৃথিবীটা হল নিরানন্দ জায়গা। এখানে আমাদের আনন্দ করার জন্য আছে চাঁদ এবং তারকারা। আমার মনে হয় পৃথিবীর লোকদের সঙ্গে মিশে সে খুব কম আনন্দই পাবে। আমি শুনেছি জাপানের দ্বীপপুঞ্জেই সে বেশী যায়।

অমা বললেন—সেই জন্যই ত আমি মনে করি আমাদের গিয়ে একবার দেখে আসা উচিত।

দাদা বললেন—তুমি সুসানোর সম্বন্ধে মিছামিছি এত ভয় কোর না। একদিন সে হয়ত এই দ্বীপে এমন কিছু করবে যাতে আমাদের দেবদেবীদের সুনাম বাড়বে।

অমা বললেন—তুমি সুসানোকে বড় বেশী ভালবাস। আমি আশা করব তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সুসানো একদিন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হবে এবং তাহলে আমাদের সুনাম কিছু বাড়বে না।

অমা এবং তাঁর দাদা যখন শৈশব পার হয়েছিলেন, তখন তাদের বাবা মারা যান। সুসানো তখন খুব ছোট ছিল। বাবা মারা যাবার সময় বোনকে দিলেন সূর্য, বড় ভাইকে চন্দ্র, ছোট ভাইকে সমুদ্র। বড় ভাই চন্দ্রে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন এবং তিনি চন্দ্রদেবতা বলে পরিচিত হলেন। অমা সূর্যে গিয়ে বাস করতে

লাগলেন এবং সূর্যকে সারাদিন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব নিলেন। তিনি যতক্ষণ ঘুমোতেন, ততক্ষণই সূর্যের আলো নিভে থাকত।

সমুদ্র পেয়ে সুসানো পৃথিবীর জলভাগে এক নতুন বাসস্থান করে নিলেন। প্রথম প্রথম তিনি বেশ খুসীই ছিলেন। নানা রকমের ছোটবড় মাছ এবং সমুদ্রের অন্যান্য জীবজন্তুদের নিয়ে তিনি খেলায় মেতে থাকতেন ; কিন্তু বেশীদিন তাঁর ভাল লাগল না। দাদা ও দিদির জন্য তাঁর মন কেমন করতে লাগল। তিনি স্থির করলেন যে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। চন্দ্রে যাবার পথে তিনি প্রথমে দিদির সঙ্গে দেখা করার জন্য সূর্যে গিয়ে পৌঁছলেন। অমা তাঁর লাল ও সোনালী সুন্দর প্রাসাদে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা একসঙ্গে বসে হালকা হলদে রংয়ের চা পান করলেন এবং তারপর অমা তাঁকে পুরো বাড়ীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সমুদ্রে তার আচরণের জন্য দিদি তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন—সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং উত্তাল তরঙ্গ দেখে তোমার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করি। সেদিন আমি প্রচণ্ড বান আসতে দেখলাম। এসব নিশ্চয়ই তোমার কাজ।

সুসানো তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—ওই বানটা কিছুই নয়, ওটা আমার এবং তিমিমাছ বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে হয়েছিল। আমরা পরীক্ষা করছিলাম কে সবচেয়ে প্রচণ্ড ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে। আমি অবশ্য জিতেছি।

দিদি জিজ্ঞাসা করলেন—কিছুদিন আগে সমুদ্রের ওপর এক সপ্তাহ ধরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা হয়ে গেল, সেটাও কি প্রতিযোগিতা ছিল ?

উত্তরে সুসানো বললেন—হ্যাঁ দিদি, তাই। শুশুক এবং আমি দেখছিলাম যে আমরা না থেমে সমানে কতক্ষণ ডিগ্‌বাজী খেয়ে যেতে পারি। এতে খালি জল ছেটানো হয়, আর খালি ঢেউ ওঠে ; ঠিক ঝড় নয়। আর সেটা এক সপ্তাহ ছিল না, ছিল সাড়ে পাঁচ দিন।

অমা ছোট ভাইকে বুঝিয়ে বললেন—দিনরাত খেলা এবং ইয়ার্কি একজন দেবতার পক্ষে ঠিক নয়। তুমি এখন ত আর শিশুটি নেই। আমি শুনেছি তুমি বেশ রাত অবধি খেলা কর। আমি ত সে সময় রোজ শুয়ে পড়ি।

দিদির এইসব উপদেশবাণী শুনে সুসানো খুবই বিরক্তবোধ করছিলেন এবং মনে মনে ঠিক করলেন, দিদিকে উত্যক্ত করে এর প্রতিশোধ নেবেন। কথা বলতে বলতে অমা তাঁর প্রাসাদের একটি বড় ঘরে তাঁকে নিয়ে এলেন। সেই ঘরে অমার কয়েকজন সহচরী তাঁতের সামনে বসে লাল সাদা হলদে রংয়ের সিল্কের ওপর ব্রোকেড বুনছিল। অমা তাঁকে বললেন—দেখ সূর্যে এখানে আমরা সকলে কিরকম কাজ করি। তুমি তোমার শুশুক আর তিমি মাছদের সঙ্গে দিনরাত খেলা না করে তাদের প্রয়োজনীয় কোন কাজে লাগাতে পার না ?

এই কথা শুনে সুসানো ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে লাফাতে লাফাতে চলে গেলেন এবং যাবার সময় তাঁতগুলিতে লাথি মেরে সব উল্টে দিলেন। ব্রোকেডের কাজ করা সিল্কগুলি তিনি টান মেরে ছিঁড়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিতে লাগলেন। এই দেখে অমার সহচরীরা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

অমা উত্তেজিতভাবে ধমকে উঠলেন—সুসানো, থাম থাম। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁতগুলি সব না ভাঙ্গল এবং ব্রোকেডগুলি সব ছিঁড়ে ফেলা না হল, ততক্ষণ তিনি ওই তাণ্ডব চালিয়ে যেতে লাগলেন। তারপরে তিনি কোমরে দু'হাত দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি দিদিকে ব্যঙ্গ করে তারপর তার দাদা চন্দ্র দেবতার কাছে যাবার জন্য রওনা হলেন। কিন্তু সুসানো চন্দ্রে আর পৌঁছতে পারলেন না। অন্য দেবদেবীরা তাঁর ওই নিন্দনীয় গর্হিত কাজের কথা শুনে তাঁর কাছ থেকে সমুদ্র কেড়ে নিলেন এবং তাঁকে

পৃথিবীতে নির্বাসিত করলেন। তিনি যখন ছোট ছিলেন, তখন থেকে অমা তাঁর সম্বন্ধে এই ভয়ই করছিলেন।

অমা এই ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পৃথিবীতে গিয়ে তাঁর ছোটভাই কিরকম আচরণ করবেন এই ভেবে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তিনি মন্তব্য করলেন—চন্দ্রদেব দাদা, আমরা আশা করি সুসানো পৃথিবীতে গিয়ে সব দেবদেবীদের বদনাম করবে না। আমি এখন শুতে যাচ্ছি।

অমা এর আগে কোনদিন দিনের বেলা এরকম শুতে যায়নি। তাঁর শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। অমা মনে মনে রাগ করে ঘরেই শুয়ে রইলেন। চন্দ্রদেবতা পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার জন্য যথাসাধ্য আলো দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন ; কিন্তু তাতে কি আর সূর্যের আলোর অভাব দূর হয়! দেবদেবীরা সকলে অমাকে অনেক অনুরোধ করলেন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ; কিন্তু অমা এলেন না। শেষকালে তাঁর দাদা চন্দ্রদেব এলেন তাঁকে বোঝাতে। এদিকে তিনি চন্দ্রলোক থেকে চলে আসায় সারা পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। দাদা অমাকে অনেক বোঝাবার পর অমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চন্দ্রদেব চন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে নিয়মিতভাবে দিনের বেলা সূর্যের আলো এবং রাত্রে চাঁদের আলো পৃথিবীকে আলোকিত করছে।

পৃথিবীতে নির্বাসিত হওয়ায় সুসানো খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তার মধ্যেই মনে একটু সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এই কথা জেনে যে তাঁকে সারাজীবন জাপানে কাটাতে হবে ; কারণ ছোটবেলা থেকে মাঝে মাঝে যাতায়াত করায় জাপানের দ্বীপগুলির সঙ্গে তাঁর কিছু পরিচয় হয়েছিল।

জাপানে গিয়ে তিনি থাকবার মত একটি জায়গা খুঁজতে বেরোলেন। একদিন তিনি যখন নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন, তখন

কান্নার শব্দ শুনে তিনি একটু অবাক হলেন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিনি এক বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা একটি পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে চেঁচিয়ে কাঁদছিলেন।

সুসানো তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—কি এমন ব্যাপার ঘটেছে যে আপনারা দুজনেই এত দুঃখ পেয়েছেন?

তাঁরা তখন তাঁকে বললেন যে দূরে একটি বিরাট হ্রদে এক বিশাল ড্রাগন বাস করে। বুড়ো লোকটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন—তার আটটি মাথা আছে এবং সে অতি ভয়ংকর।

সুসানো জিজ্ঞাসা করলেন—ড্রাগন যদি হ্রদের পাড়ে বাস করে তার জন্য আপনারা এত দুঃখিত কেন? আমি ত জানি হ্রদ এখান থেকে অনেক মাইল দূরে। দুঃখে নয়, আপনারা বোধ হয় ভয়ে কাঁদছেন।

বৃদ্ধা বললেন—ঐ ভয়ংকর দানবটি প্রতি বছর এখানে আসে একটি করে সুন্দরী মেয়েকে খাবার জন্য। কান্নায় তাঁর গলা ভারী হয়ে এল। তিনি আর বলতে না পারায় বুড়ো লোকটি বললেন—এ অঞ্চলে কয়েকটি মেয়ে ছিল। তাদের সবাইকে সে খেয়ে ফেলেছে। আমাদের আটটি মেয়ের মধ্যে সাতটিকে ড্রাগন খেয়েছে প্রতি বছর এক একটি করে। এখন আমাদের ছোট মেয়েটিই আছে।

সুসানো এই কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—কবে ওই দানবটি আসবে এবং আপনার মেয়েকে খেতে চাইবে?

তাঁরা উত্তর দিলেন—আজ রাত্রেই। প্রতি বছর ঠিক নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট দিনেই সে আসে।

সুসানো উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন—আমি আপনাদের সাহায্য করব। যদিও আমি একজন ছোট দেবতা, তাহলেও আমি সর্বশক্তি দিয়ে আপনার এই মেয়েটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।

বৃদ্ধ দম্পতি মাথা নীচু করে তাঁকে সম্মান দেখিয়ে বলে উঠলেন—একজন দেবতা!

সুসানো বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু আমি খুবই ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীতে নির্বাসিত।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—নির্বাসিত? কেন দেবতা?

সুসানো উত্তরে বললেন—সেকথা এখন থাক। আমাকে এখন আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে আপনাদের মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্য।

বৃদ্ধ দম্পতি তখন তাঁকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। তাকে দেখে সুসানোর মনে হল, একে যে কোন রকমেই হোক, বাঁচাতে হবে।

তিনি ওঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, ঐ দানব আর কি খেতে ভালবাসে জানেন?

মেয়েটি উত্তর দিল—সাহসী তরুণ দেবতা! আমি শুনেছি ড্রাগন বিন্ স্যুপ খেতে ভালবাসে।

সুসানো বললেন—সাহসী কন্যা, তুমি ঐ স্যুপ তৈরী করতে পার?

উত্তরে মেয়েটি জানাল সে ঐ স্যুপ তৈরী করতে পারে। ঐ কথা জেনে সুসানো তাকে তাড়াতাড়ি বেশী করে ঐ স্যুপ তৈরী করতে বললেন, যাতে আটটি বড় বালতি ভর্তি করা যায়।

এই কথা অনুযায়ী মেয়েটি বাবা-মার সঙ্গে স্যুপ তৈরী করতে লেগে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই আট বালতি ভর্তি বিন্ স্যুপ বাড়ীর বারান্দায় সাজিয়ে রাখা হল। সুসানো বললেন—আপনারা সকলে বাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে থাকবেন। আমি বারান্দার নীচে ওৎ পেতে থাকব। এই ব্যবস্থানুযায়ী তারা সকলে লুকিয়ে পড়ল। তার কয়েক মিনিট পরেই আটটি মাথাওলা ড্রাগন ধানক্ষেত পার হয়ে ধীরে ধীরে তাদের বাড়িতে এল। গোধূলির আলোয় তার আটজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছিল। আসন্ন ভোজের আশায় ড্রাগনের আটটি জিভ আটজোড়া ঠোঁট চাটছিল। তার আটটি নাক দিয়ে শোঁ শোঁ

করে শব্দ বেরোচ্ছিল। সুসানো আড়াল থেকে বুঝতে পারলেন যে ড্রাগন স্যুপের গন্ধ পেয়েছে। তারপরই তিনি ড্রাগনের স্যুপ খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন। চুপিসারে সুসানো তার তরোয়ালটি বার করে ড্রাগনের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন এবং খুব তাড়াতাড়ি তিনি ড্রাগনের গলার তলা দিয়ে আটটি মুণ্ড পর পর কাটতে কাটতে এগিয়ে গেলেন। সবকটি মুণ্ড কাটা হবার পর সুসানো জয়লাভ করে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। তারপরেই তিনি ড্রাগনের দেহে তরোয়াল চালালেন এবং আরো নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি তরোয়াল দিয়ে তার ল্যাজটিকে কেটে দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। তখনই তাঁর নজরে পড়ল ড্রাগনের কাটা ল্যাজে কিছু একটা জিনিস খুব চক্‌চক্ করছে। তিনি নীচু হয়ে দেখলেন যে ড্রাগনের কাটা ল্যাজের ভেতর থেকে একটি তরোয়ালের মণিমুক্তাখচিত হাতল দেখা যাচ্ছে। তিনি সেটিকে খুব সাবধানে টেনে বার করলেন। চাঁদের আলো পড়ে সেই তরোয়ালটি ঝক্‌মক্ করে উঠল। একহাতে তাঁর নিজের তরোয়াল এবং আর এক হাতে ড্রাগনের তরোয়াল নিয়ে তিনি বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে বৃদ্ধ দম্পতিকে এবং তাঁদের মেয়েকে ডাকলেন। সুসানো তাঁদের বললেন—দানব ড্রাগন নিহত হয়েছে। আমি এবার আপনাদের সুন্দরী ও সাহসী মেয়েটিকে বিবাহ করতে চাই। ড্রাগন নিহত হবার খবর শুনে এবং তাঁদের মেয়ের জীবন রক্ষা পাওয়ায় তাঁরা আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। সুসানোর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আনন্দে তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। মেয়েটি সুসানোকে নিয়ে অনেক অনেক বছর আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটাতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা যত্নও করতে লাগলেন। সুসানো দেশের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। জাপানের দ্বীপপুঞ্জে তাঁর নির্বাসিত জীবনে তিনি দেবতাদের সুনাম কোনদিন নষ্ট করেন নি। যথাসময়ে ড্রাগনের তরোয়ালটি দেশের শাসক রাজাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কাক পরী

অনেকদিন আগে এক দেশে এক পাখী-শিকারী বাস করত। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। একদিন সেই পাখী-শিকারী মারা গেল। ছেলে তখন একা হয়ে পড়ল ; কারণ তার আর কেউ ছিল না। তাদের জিনিস পত্তরের মধ্যে ছিল কেবল বাবার পাখী ধরার জাল।

ছেলেটি আর কি করে! একদিন সকালে সে ঐ জালটি নিয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে গেল, যদি কিছু ধরতে পারে। অনেকদূর গিয়ে সে একটি গাছের ওপর জালটি পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি কাক উড়ে এসে ঐ গাছে বসল এবং জালে আটকে গেল। ছেলেটি গাছের উপর উঠে ঐ কাকটিকে নামিয়ে আনতে গেল। যেই সে জালটিতে হাত রেখেছে, তখনই কাকটি কথা বলে উঠল এবং এই শুনে ছেলেটি বিস্মিত হল। কাকটি তাকে ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

ছেলেটি বলল—তোমাকে ছেড়ে দেব? কিন্তু কেন ছাড়ব? আমি আজ বনের মধ্যে পাখী ধরতেই ত এসেছি।

কাকটি তাকে অনেক অনুনয় করে বলল—আমাকে ছেড়ে দাও ; আমি উড়ে যাই।

ছেলেটি উত্তর দিল—আমি যদি তোমায় ছেড়ে দিই, তাহলে ত আমার পক্ষে খুব বোকামি হবে।

কাকটি বলল—বরং ঠিক তার উল্টো ; তুমি বুদ্ধিমানের পরিচয়

দেবে। কেন না আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি যে তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও, তুমি খুব সুন্দর একটি পাখী ধরতে পারবে এবং সেটিকে তুমি খুব ভাল দামে সুলতানের কাছে বিক্রী করতে পারবে।

এই কথা শুনে ছেলেটি কাকটিকে ছেড়ে দিল এবং আবার গাছের ওপর জালটি বিছিয়ে দিয়ে গাছের পাশে চুপ করে বসে রইল। আশ্চর্যের বিষয়, সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে একটি খুব সুন্দর পাখী ঐ গাছের দিকে উড়তে উড়তে এসে সোজা জালের মধ্যে বসে পড়ল।

ছেলেটি ঐ দেখে আবার পাখীটিকে ধরে নেবার জন্য গাছে উঠল এবং পাখীটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এরকম সুন্দর পাখী সে আগে আর দেখেনি। যেমন তার গড়ন, তেমনি তার রংয়ের বাহার। সে আর সময় নষ্ট না করে পাখীটিকে একটি খাঁচার মধ্যে পুরে নিয়ে সুলতানকে দেখাবার জন্য রওনা হল।

সুলতান পাখীটিকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন এবং তখনই তাঁর ইচ্ছে হল পাখীটিকে কিনে নেবার। পাখীটির কত দাম হবে, সেকথা ছেলেটিকে বলবার সুযোগ না দিয়েই সুলতান তাকে অনেক টাকা দিলেন যা সে সারাজীবনেও উপার্জন করতে পারত না। সুলতান তারপর পাখীটিকে একটি সোনার খাঁচায় রাখিয়ে দিলেন এবং সেই থেকে দিনে রাত্রে সবসময়েই পাখীটিকে তাঁর কাছে রাখতেন।

সুলতানের উজির (মন্ত্রী) এই ব্যাপারটিকে ঘৃণা এবং ঈর্ষার চোখে দেখলেন। কে এই পাখী-শিকারী বালক, যে এমনভাবে সুলতানকে খুশি করে একটি পাখী বিক্রী করে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলল? সে এইভাবে কেন রাজ অনুগ্রহ লাভ করবে? উজিরের কুচক্রী মনে এইসব প্রশ্ন জাগছিল আর তিনি কিভাবে ছেলেটিকে ফাঁদে ফেলা যায় মনে মনে সেই মতলব আঁটতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে উজির সুলতানকে বললেন—আপনার পাখীটি

এত অসামান্য সুন্দর যে সোনার খাঁচা ওর ঠিক উপযুক্ত স্থান নয়। হাতীর দাঁতের একটি প্রাসাদ হবে ওর উপযুক্ত স্থান।

সুলতান উত্তর দিলেন—আমি অবশ্য এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত ; কিন্তু এত হাতীর দাঁত কোথা থেকে যোগাড় করা যাবে ?

উজির বললেন—যে পাখী-শিকারী পাখীটিকে এখানে এনেছে, এ কাজের ভার তারই নেওয়া উচিত।

সেই কথা অনুযায়ী পাখী-শিকারী ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দেওয়া হল যে পাখীটির প্রাসাদ তৈরী করার জন্য যত হাতীর দাঁত লাগবে, চল্লিশ দিনের মধ্যে তাকে তা যোগাড় করে আনতে হবে।

এই কথা শুনে ছেলেটি থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—কিন্তু···

উজির তাকে বললেন—এই হল সুলতানের হুকুম।

ছেলেটি তারপর বলল—এত হাতীর দাঁত কোথায় পাওয়া যাবে ? এইটুকু বলেই সে বিমূঢ় হয়ে রইল এবং কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না।

উজির আবার জোর দিয়ে বললেন—তোমাকেই তা খুঁজে বার করতে হবে। আর তুমি জান বোধহয় সুলতানের হুকুম অমান্য করলে তার কি শাস্তি।

ছেলেটি খুব ভালই জানত যে এই অদ্ভুত হুকুম না মানলে তার মুণ্ডটি কাটা যাবে। তাই সে উজিরের কথা শুনে গভীর উদ্বেগ নিয়ে সুলতানের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে এসে সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ; কিন্তু কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। এই অসম্ভব কাজ কিভাবে সে করবে এই চিন্তাই তাকে পেয়ে বসেছিল। তার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এক পা হু'পা এগিয়ে যেতেই সে একটি শব্দ শুনতে পেল এবং পেছন ফিরে দেখল সেই কাকটি তার দিকেই উড়ে আসছে।

কাকটি তার কাঁধে বসে তাকে জিজ্ঞাসা করল—তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন ? কি ব্যাপার আমাকে বল।

ছেলেটি উত্তর দিল—আমি ঐ সুন্দর ছোট পাখীটি বিক্রী করে প্রচুর অর্থ অবশ্য পেয়েছি ; তাতে আমার কোন লাভ হল না। সুলতান এখন হুকুম দিয়েছেন যে ঐ পাখীটিকে রাখার জন্য হাতীর দাঁতের একটি প্রাসাদ তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য যত হাতীর দাঁত লাগবে আমাকে চল্লিশ দিনের মধ্যে যোগাড় করে দিতে হবে, না হলে আমার মুণ্ড কাটা যাবে। ওঃ, আমি যে কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না।



কাক হালকাভাবে বলল—কিছু ভেবনা। আমি তোমাকে যেরকম বলব, তুমি সেইভাবে কাজ করে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি এখন সুলতানের প্রাসাদে একবার যাও এবং গিয়ে বল যে সুলতানের ইচ্ছা পূরণ করতে হলে তোমার চাই চল্লিশ গাড়ী ভর্তি মদ। ওগুলি পেলে গাড়ীগুলি নিয়ে তুমি এক ধার দিয়ে বনের অনেকটা ভেতরে চলে যাবে। ওখানে তুমি দেখবে চল্লিশটি গভীর লম্বা গর্ত কাটা আছে। ওখানে হাতীরা সব জল খেতে আসে। তুমি ওই চল্লিশটি গর্তে মদ ঢেলে দেবে। হাতীরা জল খেতে এসে ঐ মদ খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে। সেই সুযোগে তুমি যত পার হাতীর দাঁত নিতে পারবে।

ছেলেটি কাককে ধন্যবাদ দিল এবং তার কথামত কাজ করল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে অনেক হাতীর দাঁত নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এল।

সুলতান ত অত হাতীর দাঁত দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তখনই পাখীর জন্য হাতীর দাঁতের প্রাসাদ তৈরী করবার হুকুম দিলেন। ছেলেটি যেভাবে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্যবস্থা করেছে, সেজন্য সুলতান খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং ছেলেটিকে আরও অনেক উপহার ও অর্থ দিলেন।

সুলতানের কৃপাদৃষ্টি থেকে ছেলেটিকে বঞ্চিত করার যে চক্রান্ত উজির মনে মনে করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে তিনি আরও অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর মুখ জলভরা মেঘের মত কাল হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে উজির একদিন সুলতানকে বললেন—হাতীর দাঁতের প্রাসাদে রাখা একটি অপূর্ব সুন্দর পাখী আপনার রয়েছে ; এরকম দ্বিতীয়টি এর আগে কখনও দেখা যায় নি। কিন্তু হে রাজাধিরাজ, আপনার কি এটি আশ্চর্য লাগে না যে পাখীটিকে কখনও গান গাইতে শোনা যায় না। উজির আরও বললেন—পাখীটি কোন বুনো পাখী নয়। ওকে ধরে এনে আপনার কাছে বিক্রী করার আগে ওর নিশ্চয়ই একজন মালিক ছিল। আমার বিশ্বাস যদি ওর সেই প্রথম মালিককে এখানে আনান যায়, তাহলে পাখীটি গান করবে।

সুলতান সে কথা শুনে বললেন—তা ঠিক ; কিন্তু ওর প্রথম মালিককে কোথায় পাওয়া যাবে কে বলতে পারবে ?

উজির আস্তে আস্তে বললেন—ওই পাখী-শিকারী ছেলেটি ছাড়া আর কেউ বোধহয় বলতে পারবে না।

সুলতান উজিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, খুব সম্ভব সেই বলতে পারবে।

কুচক্রী পরামর্শদাতা উজির বললেন—আপনি আমার ওপর এটি ছেড়ে দিতে পারেন। আমি ওই ছেলেটিকে বলে পাখীটির মালিককে এখানে আনার ব্যবস্থা করব।

ছেলেটিকে আবার ডেকে আনিয়ে উজির তাকে বললেন—সুলতানের হুকুম, চল্লিশ দিনের মধ্যে পাখীটির প্রথম মালিককে এখানে আনতে হবে। তা না হলে কিন্তু তোমার মুণ্ড কাটা যাবে, বুঝতেই পারছ।

ছেলেটি অনুনয় করে উজিরকে বলল—কিন্তু, আমি ত ওর মালিককে জানি না। বনের মধ্যে পাখীটি উড়ছিল, আমি ওকে ধরে নিয়ে এসেছি।

উজির বললেন—ওসব আমি শুনতে চাই না। সুলতানের হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। না হলে তার শাস্তি কি তুমি ত জানই।

এই কথা শুনে ছেলেটি বাড়ী চলে গেল এবং গভীর হতাশায় ও দুশ্চিন্তায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। এমন সময় সেই কাকটি জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে এসে তার কাঁধে বসল এবং জিজ্ঞাসা করল—আবার কি এত চিন্তা করছ ? ছেলেটি তখন তাকে তার নতুন সমস্যার কথা এবং তার সমাধান করতে না পারলে কি হবে সব বলল।

কাক একটু হেসে বলল—এ আর এমন কি ! তোমাকে যেমন যেমন বলব তুমি আবার সেইভাবে কাজ কর, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন যা বলি, ভাল করে মন দিয়ে শোন। তুমি আবার

প্রাসাদে যাও এবং গিয়ে বল যে সুলতানের ইচ্ছা অনুযায়ী পাখীটির মালিককে আনতে হলে তোমার একটি বড় জাহাজ দরকার হবে। ঐ জাহাজে থাকবে চল্লিশজন দাসী, একটি বাগান এবং একটি স্নান-গৃহ। তারপর তুমি ওই জাহাজটি নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করবে। যেতে যেতে তুমি একটি দ্বীপ দেখতে পাবে—দ্বীপটি দেখতে সমুদ্রের মাঝখান থেকে ওঠা একটি উঁচু পাহাড়ের মত। ঐখানে পৌঁছে তুমি জাহাজ থামিয়ে নোঙর ফেলবে। ওই দ্বীপটি হল পরীদের রাজ্য এবং ওদের রাণীই হলেন ওই পাখীটির মালিক। পরীরা যখন দেখবে বড় একটি জাহাজ তাদের রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন স্বাভাবিক ঔৎসুক্য বশেই তারা সকলেই জাহাজে উঠে আসতে চাইবে ; তুমি কিন্তু রাণী ছাড়া অন্য কাউকে জাহাজে উঠতে দিও না। রাণী জাহাজে এলে তাঁকে যেন ভালভাবে সমাদর করা হয় তার ব্যবস্থা কোরো। তিনি জাহাজে অবস্থান যখন বেশ উপভোগ করবেন, সেই সময় তুমি নোঙর তুলে দ্রুতগতিতে জাহাজটিকে নিয়ে বাড়ী ফেরার জন্য রওনা হবে।

কাকের কথা অনুযায়ী ছেলেটি ঠিক ঠিক মত সব কাজ করল। পরীরাণীকে যখন একটি ছোট নৌকায় করে জাহাজটির কাছে আনা হল ছেলেটি তখন তাকে জাহাজে উঠে আসার জন্য সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তারপর চল্লিশজন পরিচারিকা তাঁকে দেখাশোনার ভার নিল। প্রথমে তাঁকে বাগানটি দেখান হল, তারপর তাঁকে সুন্দর স্নানগৃহে স্নান করে ক্লান্তি দূর করতে বলা হল। ইতিমধ্যে পরিচারিকারা রাণীকে মিষ্টি খাবার খেতে দিল এবং সুগন্ধি মাখিয়ে দিল। রাণী স্নান করতে করতেই জাহাজটি সমুদ্রে অনেকটা এগিয়ে গেল। রাণী যখন স্নান ঘর থেকে বেরিয়ে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগলেন তাঁর রাজ্য (দ্বীপটি) আর দেখা যাচ্ছে না এবং জাহাজ বেশ জোরে এগিয়ে চলেছে তখন তাঁর মনে ভয় হল। তিনি ভাবলেন—কেউ কি তাঁকে বিপদে ফেলবে ? কোথায়ই বা তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? তিনি পরিচারিকাদের অনুনয় করে জিজ্ঞাসা

করলেন—কি ব্যাপার ? তখন ছেলেটি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বুঝিয়ে বলল যে একটি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে সুলতানের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এতে তাঁর কোন রকম ক্ষতিই হবে না।

যথাসময়ে জাহাজটি সুলতানের রাজ্যে এসে পৌঁছল। ছেলেটি পরীরাণীর হাত ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে নামিয়ে এনে প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগল। সুলতানের কাছে ইতিমধ্যেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে জাহাজটি ফিরে এসেছে। তিনি তখন হাতীর দাঁতের প্রাসাদে রাখা সুন্দর পাখীটিকে পাশে নিয়ে সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করছিলেন।

ছেলেটি এবং পরীরাণী যখন পাশাপাশি সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল তখনই অপূর্ব মিষ্টি সঙ্গীতে সারা ঘর ভরে গেল এবং মনে হল যেন স্বর্গের দ্বার খুলে গেল। পরীরাণীকে দেখতে পেয়েই পাখীটির আনন্দের আর সীমা থাকল না ; সে মনের আনন্দে গান গেয়েই চলল। গানের মিষ্টি সুরে ঐখানে উপস্থিত সকলেই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। রাণী নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর মনে যে ভয় ছিল তা কোথায় মিলিয়ে গেল। সুলতানের কাছে কোনটি বেশী আনন্দের—পাখীটির গান না পরীরাণীর সৌন্দর্য—তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

তিনি আদেশ করলেন পরীরাণীকে তাঁর পাশেই উপযুক্ত আসনে বসাবার জন্য। পাখীর সুন্দর গানে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল এবং সুলতানের মনে হল তাঁর চেয়ে সুখী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তিনি পরীরাণীকে বিবাহ করে তাঁর রাণী করতে চাইলেন।

পরের দিনই বিবাহ হয়ে যথোপযুক্ত ভোজসভা হয়ে গেল।

কেবলমাত্র উজিরের দুষ্টবুদ্ধি ছাড়া সুলতানের প্রাসাদে অপূর্ব সুখ আর আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। উজির ভেবে পাচ্ছিলেন না আর কি চক্রান্ত করা যায়।

কিছুদিন পরে সুলতানা (রাণী) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজ্যের সব বড় বড় ডাক্তারদের ডাকা হল ; কিন্তু কেউই তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারলেন না। ওঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তার বললেন—রাণী ত সাধারণ মানবী নন, তাই মর জগতের ওষুধে তাঁর কোন উপকার হচ্ছে না। তাঁর নিজের পরীরাজ্যের ওষুধই তাঁর দরকার।

ঈর্ষান্বিত উজির ওখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ভাবলেন পাখী-শিকারী ছেলেটিকে জব্দ করার একটি সুযোগ এবার পাওয়া গেছে। তিনি বললেন—ওই ছেলেটিই পরীরাণীকে এখানে এনেছিল ; সুতরাং সে-ই পরীরাজ্যে গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আসুক।

সুলতান তদনুযায়ী আবার ছেলেটিকে জাহাজটি দিলেন এবং সে আবার পরীরাজ্যের দিকে রওনা হল। এবার আর কোন পরীই জাহাজের দিকে এগিয়ে এল না। তাকে নিজেই অনেক কষ্ট করে খাড়া উঁচু পাহাড়ের ওপর উঠতে হল। তারপর সে দূরে প্রাসাদটি দেখতে পেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে এল। সে দেখল যে প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুটি বড় সিংহ পাহারা দিচ্ছে এবং তাকে দেখতে পেয়ে, তার চলার শব্দ শুনে এবং গন্ধে তারা দাঁত বার করে গর্জন করতে লাগল।

ছেলেটি এখন কি করে! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সে চুপ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে যদি এগিয়ে যায়, তাহলে সিংহ দুটি তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে ; আবার সে যদি ওষুধ না নিয়ে ফিরে যায়, তাহলে শুধু যে সুলতানাই মারা যাবে এবং সুলতান মনের দুঃখে ভেঙে পড়বেন তাই-ই নয়, তারও মুণ্ডটি কাটা যাবে।

ভয়ে দুশ্চিন্তায় যখন সে ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সময় কাকটি কোথা থেকে উড়ে এসে ওর কাঁধে বসল এবং ওকে জিজ্ঞাসা করল—আবার কি হল ? তুমি ভয়ে কাঁপছ কেন ?

ছেলেটি তখন তাকে সব বলল। শুনে কাক বলল—এ ত তুচ্ছ ব্যাপার। এই পালকটি তুমি নাও। তুমি যখন সিংহের কাছে যাবে,

এই পালকটি তোমার সামনে ধরে থাকবে এবং ওদের কাছে গিয়ে পড়লে তুমি এই পালকটি ওদের গায়ে ছুঁইয়ে দিও, তাহলে ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

এই সময়োচিত সাহায্যের জন্য কাককে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটি ওই পালকটিকে ভাল করে ধরে এগিয়ে চলল। সে যখন সিংহ দুটির কাছে এল, তখন তারা চুপচাপ মাটিতে শুয়ে রইল। ছেলেটি তখন পালকটি ওদের গায়ে ছুঁইয়ে দিয়ে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে এগিয়ে গেল।

প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে পৌঁছতেই পরীরা তাদের রাণীর খবর জানবার জন্য তাকে ঘিরে ধরল। যখন তারা তাদের রাণীর অসুস্থতার খবর শুনল, তখন তারা তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ওষুধটি এনে ছেলেটির হাতে দিল। সে তখন ওষুধটি নিয়ে আবার সুলতানের রাজ্যের দিকে জাহাজ নিয়ে রওনা হল।

ওষুধটি হাতে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সুলতানের প্রাসাদের ভেতরে চলে গেল। সুলতান নিজে তাকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানা (পরীরাণী) যে ঘরে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেখানে নিয়ে গেলেন। সে রাণীর শয্যার পাশে বসে তাঁর মুখে ওষুধটি দিয়ে দিল। এই সময়েই কাকটি আবার উড়ে এসে তার কাঁধে বসল। ওষুধটা খেয়ে সুলতানা চোখ খুললেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ বোধ করলেন। তিনি প্রথমেই কাককে দেখে বললেন—ও, তুমি সেই কেলে কুঁড়ে ক্রীতদাসী।

কাকটি একবার ছেলেটির এ কাঁধে, একবার ও কাঁধে উড়ে উড়ে বসতে লাগল।

পরীরাণী বলতে লাগলেন—আমি বুঝতে পেরেছি তুমি এই নির্দোষ ছেলেটিকে অসম্ভব কাজগুলি সম্ভব করতে সাহায্য করেছ এবং ওকে শাস্তি পাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছ। এখন তুমি আমার জীবন রক্ষায় সাহায্য করেছ।

এইসব কথা বলে পরীরাণী উঠে বসলেন ; তাঁর চোখে আবার স্বাভাবিক দ্যুতি ফিরে এল এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলেন।

তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠায় সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সুলতানাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, বল ত আমাদের ব্যাপারে কাকের সঙ্গে কি সম্পর্ক ?

পরীরাণী উত্তর দিলেন—ও আমার দাসী ছিল ; কিন্তু কাজকর্মে ও ছিল অত্যন্ত অলস। তাই আমি ওকে শাস্তি দেবার জন্য কাক করে দিয়েছিলাম। এখন আমি ওকে ক্ষমা করলাম।

সেই মুহূর্তেই কাক অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার জায়গায় একটি সুন্দরী বালিকা দেখা গেল। পাখী-শিকারী ছেলেটি তাকে দেখে মুগ্ধ হল। সুলতান ও সুলতানার অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে হল।

এর পর কি হল ?

সুলতান সেই ছেলেটিকে তাঁর উজির নিযুক্ত করলেন এবং আগের কুচক্রী উজিরকে রাজ্যের শেষ প্রান্তে নির্বাসিত করলেন।

সুলতান এবং পরীরাণী, আগের পাখী-শিকারী এবং বর্তমানের উজির এবং তার কাক-পরী আজীবন সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

বরপ্রার্থনা

ছোট একটি গ্রাম। অসটিয়া থেকে রোম যাবার পথের এই গ্রামটিতে রাস্তার ধারে একটি ছোট কুটিরে একজন লোক বাস করতেন। পাড্‌রে উলিভো বা ফাদার উলিভো নামে তিনি প্রতিবেশীদের কাছে পরিচিত ছিলেন। গরীব হলেও তাঁর মন ছিল খুব উদার। তাঁর যেটুকু যা থাকত, তা তিনি তাঁর চেয়ে যারা আরও গরীব, তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। রোমে ভ্রমণার্থী, বেকার কৃষক, ভিখারীরা, তাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তার ছোট কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াতেন; কারণ তাঁরা জানতেন যে যদি তাদের প্রয়োজনের জিনিস তাঁর কাছে থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তা ওদের দেবেন।

একদিন শীতের দুপুরে উলিভো শুনতে পেলেন কে বা কারা যেন তাঁকে ডাকছে। তিনি দরজা খুলে দেখলেন একদল ভ্রমণার্থী দাঁড়িয়ে। সংখ্যায় তাঁরা বারজনের কম নয়। সকলে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও শীতে কাতর। এই দেখে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেলেন; কারণ তিনি জানতেন তাঁর বাড়ীতে কেবলমাত্র আধখানি পাঁউরুটি এবং আধ বোতল মদ আছে। ঘর গরম রাখার জন্য যে আগুন প্রায় নিভে আসছিল, তাতে দেবার মত কাঠও ঘরে ছিল না।

তিনি মনে মনে ভাবলেন—যাই হোক, কিছু না থাকার চেয়ে নিস্তেজ আগুনও ভাল; খালি পেটে থাকার চেয়ে এক টুকরা রুটি ও এক চুমুক মদও ভাল।

এই ভেবে নিয়েই তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন—ভেতরে আসুন। এই বলে তিনি তাঁর হঠাৎ-আসা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা ভেতরে এলে তিনি তাঁদের প্রায় নিভে আসা আগুনের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের বারজনকে চেয়ার ও বেঞ্চিতে বসতে দিলেন।

তিনি তাঁদের বললেন—আমি খুব দুঃখিত। আপনাদের আপ্যায়ন করার মত বিশেষ কিছুই আমার নেই। বছরের এই সময়টাতে বিশেষ কেউ ত এদিকে আসে না। আমার বাড়ীতে মাত্র আধখানা পাঁউরুটি আছে।

ওঁদের মধ্যে একজনকে ভ্রমণার্থীদের নেতা বলে মনে হল। তিনি বললেন—ওর জন্য কিছু ভাববেন না। আমার মনে হয় আধখানা রুটিতেই আমাদের ভালভাবে চলে যাবে।

উলিভো রান্নাঘরে গিয়ে খাবার-রাখা-আলমারীটা খুললেন আধখানা পাঁউরুটি বার করার জন্য। আলমারীটা খুলেই উনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে ভেতরে তেরটি টাটকা ছোট পাঁউরুটি রয়েছে। তাঁর কাছে আরও বিস্ময়ের বিষয় হল যখন তিনি দেখলেন তার ওপরের তাকে যথেষ্ট পনির (চীজ্) এবং এক পাউণ্ডেরও বেশী টাট্‌কা মাখন রয়েছে।

যে ঘরে আগুনের কাছে বসে তাঁর অতিথিরা নিজেদের একটু গরম করে নিচ্ছিলেন, তিনি ওইসব জিনিস ঐ ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি ওঁদের বলছিলেন—কি রকম অলৌকিকভাবে—বলেই আগুনের জায়গায় চোখ পড়তেই তিনি থেমে গেলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন যে নিভে-আসা আগুনের জায়গায় ছ'টি ভাল পাইন কাঠ সুন্দরভাবে জ্বলছে। আরও কয়েকটি কাঠ পাশে রাখা রয়েছে।

এতক্ষণে উলিভো বুঝতে পারলেন যে সত্যই অলৌকিক কিছু ঘটছে। তিনি ঠিক করলেন, এখন আর কিছু দেখে বিস্মিত হব না, অন্ততঃ দেখাব না যে আমি বিস্মিত হয়েছি। সুতরাং তিনি টেবিলে খাবার সাজিয়ে অতিথিদের আহ্বান করলেন।

ভ্রমণার্থীদের নেতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ঘরে কি মদ আছে ?

উলিভো উত্তর দিলেন—আধ বোতল আছে বোধ হয়। আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখে আসছি।

সকালে যেখানে তিনি দেখেছিলেন জায়গাটি খালি, সেখানে তিনি দেখলেন যে লাল রংয়ের ভাল মদ বার বোতল রয়েছে। এবার আর তিনি ততটা বিস্মিত হলেন না।

উলিভো ও তাঁর অতিথিদের ভালভাবেই আহার হল এবং নতুন কাঠের আগুনে ঘরটি বেশ গরম হয়েছিল। তাই তাঁরা শীতে ঐ উত্তাপও উপভোগ করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে অতিথিরা উঠে পড়লেন। তাঁরা বললেন যে সেই রাত্রের মধ্যেই তাঁরা রোমে পৌঁছবেন আশা করছেন। তাঁরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা উলিভোর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে তাঁকে অতিথিসেবার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। ঐ দলের কনিষ্ঠ যাত্রী যখন তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন উলিভোকে বললেন—আমাদের নেতার কাছ থেকে আপনার কিছু বর প্রার্থনা করা উচিত ছিল। আপনি যা কিছু প্রার্থনা করতেন, উনি আপনাকে সেই বর দিতেন।

উলিভো জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কি করে বর দিতে পারবেন ?

—আপনি তাহলে জানেন না আমরা কারা ?

উলিভো স্বীকার করলেন—না, আমি জানিনা। কেবল এইটুকু জানি যে আপনারা সাধারণ ভ্রমণার্থী নন।

যুবকটি উত্তর দিলেন—আমরা যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যদল ; এবং যিনি আমাদের নেতা তিনি হলেন খ্রীষ্ট স্বয়ং।

এই কথা শুনে উলিভো সেই নেতার কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তাঁর হাঁটু ধরে তাঁর পোশাকের শেষভাগ চুম্বন করলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন —আপনি কি আমায় একটি বর দেবেন ?

প্রভু উত্তর দিলেন—সানন্দে দেব। তুমি কি চাও বল ?

উলিভো বললেন—আমি চাই যে আমার ঘরে আগুনের জায়গার পাশে চেয়ারে যে বসবে, যতক্ষণ আমি না ইচ্ছা করব, সে যেন উঠতে না পারে।

প্রভু বললেন—তুমি যদি তাই চাও, তাহলে তাই হবে। এই বলে তিনি এগিয়ে চললেন। যুবকটি বর প্রার্থনা শুনে উলিভোকে বললেন—কি বোকার মত বর প্রার্থনা করলেন? আপনি আর অন্য কিছু চান।

উলিভো জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি মনে করেন, আমি আর একটি বর চাইতে পারি?

তিনি উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই চাইতে পারেন।

তিনি আবার প্রভুর কাছে ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করলেন।

প্রভু বললেন—সানন্দে দেব। বল তুমি কি বর চাও?

উলিভো বললেন—আমি চাই যে যদি আমার বাগানের চেরী গাছে কেউ ওঠে, তাহলে আমি ইচ্ছা না করা পর্যন্ত সে যেন গাছ থেকে নামতে না পারে।

প্রভু বললেন—তুমি যদি তাই ইচ্ছা কর, তাহলে তাই হবে।

যুবকটি এই প্রার্থনা শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি জন্য এরকম একটি বর প্রার্থনা করলেন? আপনার চেরী গাছে উঠে কেউ না নামতে পারলে, তাতে আপনার কি উপকার হবে? আপনি আর কিছু চেয়ে নিন।

উলিভো জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বলছেন, আমি আরও একটা বর চাইতে পারি?

যুবকটি উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, চাইতে পারেন; তবে এইটিই কিন্তু শেষ। তিনটির বেশী বর কেউ পায় না।

এই কথা শুনে উলিভো আবার প্রভুর কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তৃতীয় বর প্রার্থনা করলেন।

প্রভু বললেন—ঠিক আছে। এইটিই কিন্তু শেষ। বল তুমি কি চাও?

উলিভো বললেন—আমি চাই যে আমি যদি তাস খেলতে বসি, তাহলে সব সময়েই যেন আমি জিততে পারি।

প্রভু বললেন—তুমি যদি তাই চাও, তাই হবে।

তারপর তিনি ও তাঁর শিষ্যরা এগিয়ে গেলেন। মানুষের বোকামি দেখে তাঁরা দুঃখবোধ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। যুবকটি বললেন—উনি ওঁর আত্মার মুক্তি হোক—এই বর চাইতে পারতেন অথবা দীর্ঘ-জীবন, অথবা সুখশান্তি বা ঐশ্বর্য চাইতে পারতেন।

প্রভু বললেন—আমি জানি। কিন্তু তোমরা ত ওকে এসব কথা বলতে পার না। ওর নিজের পছন্দ মত ও চেয়েছে। যাই হোক, আমরা আশা করব বোকামি করে সে নিজে যে তিনটি বর প্রার্থনা করেছে, তাতে ওর কোন ক্ষতি হবে না।

অনেক বছর পার হয়ে গেল। উলিভোর জীবনে এই তিনটি বরের ফলে কোন পরিবর্তনই হল না। সে কখনও তাস খেলত না। কাউকে চেয়ারে বা চেরী গাছে আটকে রাখার মত কিছুই ঘটেনি।

আরও কয়েক বছর পরে ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন একজন রোগা কাল লোক তার দরজায় ডাকাডাকি করতে লাগলেন। তিনি বললেন—আমার সঙ্গে চলে এস।

উলিভো বললেন—আমি আপনাকে চিনি। আপনি ত মৃত্যু।

উত্তর হল—হ্যাঁ।

উলিভো বললেন—মৃত্যুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ত লাভ নেই আমি জানি। আপনি যদি চান আমাকে যেতে হবেই। তবে আমাকে তৈরী হয়ে নিতে কয়েক মিনিট সময় দিন। ততক্ষণ আপনি আগুনের ধারে এই চেয়ারে একটু বসুন।

মৃত্যু বসলেন। কয়েক মিনিট পরে উলিভো বললেন যে তিনি তৈরী হয়ে নিয়েছেন। মৃত্যু চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন; কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। চেয়ার থেকে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে

রাগত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করে রেখেছ? এ আবার কিরকম কৌশল?



উলিভো উত্তর দিলেন—এটি একটি মন্ত্রপূত চেয়ার। আমি যতক্ষণ না চাইব, ততক্ষণ আপনি এই চেয়ার থেকে উঠতে পারবেন না।

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে তুমি কতক্ষণ আমাকে এখানে আটকে রাখতে চাও। আমার অনেক কাজ আছে; আমি এভাবে সময় নষ্ট করতে পারি না।

উলিভো উত্তর দিলেন—যতক্ষণ না আপনি কথা দেবেন যে তিনশ' বছরের মধ্যে আপনি আর এখানে আসবেন না।

মৃত্যু কথা দিলেন। এছাড়া তাঁর ত আর উপায় ছিল না। না হলে তাঁকে অনন্তকাল আগুনের পাশে ওই চেয়ারেই বসে থাকতে হত।

তিনশ' বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। উলিভোর মনে হল যেন খুব তাড়াতাড়ি বছরগুলি চলে গেল। এই সময়ে তিনি বেশ জীবন উপভোগ করছিলেন। তিনি আরও কিছুদিন এইভাবে কাটাতে চাইছিলেন।

তিনশ' বছর পরে মৃত্যু আবার এলেন। উলিভো বললেন—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

মৃত্যু বললেন—তুমি তৈরী হবার জন্য ঠিক পাঁচ মিনিট সময় পাবে। আর কোন কৌশল খাটিও না। আমি যতক্ষণ থাকব, কোথাও বসব না।

উলিভো তাঁকে বললেন—ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করতে পারেন। আমাদের বাগানে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতে পারেন।

মৃত্যু তার কথামত বাগানে গেলেন। বাগানটি অবশ্য ছোট এবং অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু ওখানে একটি চেরী (কাল জাম জাতীয় ফল) এবং অন্যান্য দু'একটি ফলের গাছ ছিল। চেরী গাছটিতে পাকা চেরী ফল ভর্তি হয়ে ছিল।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উলিভো তাঁকে বললেন—আপনি কিছু চেরী ফল খান না। আমি ত শীঘ্রই মারা যাব ; আমার ত আর ওগুলো কোন কাজেই লাগবে না।

মৃত্যু কয়েকটি চেরী খেয়ে দেখলেন যে ওগুলি দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে বরং তার চেয়েও ভাল। বড় এবং ভাল ফলগুলি ছিল গাছটির ওপরের ডালে। ওগুলি নেবার জন্য মৃত্যু গাছের ওপর উঠলেন। তারপর আরও ভাল ফলগুলি নিতে তিনি আরও ওপরে উঠলেন।

কয়েক মিনিট পরে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উলিভো বললেন—আমি এখন তৈরী। আমরা এবার যেতে পারি।

মৃত্যু তখন গাছ থেকে নামবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনি ওপরে উঠতে চেষ্টা করলে উঠতে পারছিলেন ;

কিন্তু এক পা নামতে গেলেই তিনি আটকে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—হতভাগা, তুমি আমাকে আবার কৌশল করে আটকাচ্ছ।

উলিভো বললেন—হয়ত তাই। আর তিনশ' বছর হলে কেমন হয়?

মৃত্যু তখন নিরুপায় হয়ে কথা দিলেন যে আরও তিনশ' বছরের মধ্যে তিনি আর আসবেন না।

উলিভো গত তিনশ' বছরের মত আবার এই তিনশ' বছর বেশ আনন্দে কাটালেন। তিনি অবশ্য জানতেন যে তিনি অমর নন, একদিন না একদিন তাঁকে মরতে হবে। পরের বার তিনশ' বছর শেষ হলে মৃত্যু যেদিন এলেন, সেদিন উলিভো তৈরী হয়েই ছিলেন। মৃত্যু এবার তাঁর দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে তাঁকে ডাকলেন—শীগগির চলে এস। আর কোন কৌশল খাটাবে না। তুমি না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

উলিভো বাড়ীর বাইরে এসে একবার তার ছোট কুটিরের দিকে তাকিয়ে নিলেন। এই বাড়ীতেই তিনি ছশ একষট্টি বছর কাটিয়েছেন। তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল এবং তারপর তিনি মৃত্যুর সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

কিছুদূর যাবার পর মৃত্যু তাঁকে বললেন—তুমি ঐ রাস্তাটি ধরে সোজা স্বর্গের পথে চলে যাও। যদিও তুমি আমার সঙ্গে কৌশল করে আমাকে হয়রান করেছ, তবুও আমার মনে হয় তুমি স্বর্গের ভেতরে যেতে পারবে।

উলিভো তাঁর কথা মত তাঁর দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা ধরে স্বর্গের দিকে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর এগিয়ে তিনি নরকের বাইরের দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং দেখলেন যে শয়তান সেখানে বসে আছে। তিনি শুনতে পেলেন নরকের ভেতরে অনেক আত্মা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। ঐ শুনে তিনি ওখানে থামলেন।

সন্দেহের চোখে শয়তান উলিভোর দিকে তাকিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—কি চাও ?

উলিভো উত্তরে বললেন—আমি স্বর্গের পথে যাচ্ছি। আমার মনে হয় স্বর্গের ভেতর একবার ঢুকে গেলে আমি আর তাস খেলার সুযোগ পাব না। তাই ভাবছিলাম শেষবারের মত একবার তাস খেলে নিলে কেমন হয় ?

শয়তান ভাবল লোকটিকে নরকে ঢুকিয়ে দেবার একটা সুযোগ হতে পারে। এই ভেবে সে বলল—তা মন্দ নয়। আমি তোমার সঙ্গে খেলব। শয়তান তাস বার করল এবং নরকের দরজার মুখেই উলিভো তার পাশে বসলেন।

শয়তান তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—কিসের জন্য তুমি খেলতে চাও ?

উলিভো সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন—হারলে আমার আত্মা তুমি নেবে, আর জিতলে তোমার কাছে যেসব আত্মা আছে, তার বারটি আমাকে দেবে !

শয়তান এই কথা শুনে নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তাসের সব কলাকৌশল জানত এবং কখনও কারুর কাছে হারেনি। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবল এই বোকা লোকটি তার নিজের আত্মা বাজী রাখতে চায়। তাস দিতে দিতে তিনি বললেন—আমি রাজী।

উলিভো অবশ্য জিতলেন এবং শয়তান হেরে গেল। শয়তানকে তখন নরক থেকে বারটি আত্মাকে ছেড়ে দিয়ে তার বিপক্ষের হাতে দিতে হল। তখনও শয়তানের মনে হচ্ছিল খেলায় নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়ে গেছে এবং এর পরের বার খেললে সে হয়ত হারবে না। তাই সে পরপর অনেকবার উলিভোর সঙ্গে খেলল এবং প্রতি বারই হারল। প্রতি বারই উলিভো বারটি করে আত্মা জিতে নিল। শেষে দেখা গেল নরক প্রায় খালি হয়ে এসেছে। শয়তান তখন বুঝল যে

এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে এবং তার জেতবার কোন আশা নেই। সে তখন রেগেমেগে তাসগুলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ভুম করে নরকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। উলিভো উঠে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিলেন এবং আবার স্বর্গের দিকে এগোতে লাগলেন।

শয়তান তাস খেলার বাজীতে হেরে গিয়ে যেসব আত্মাকে উলিভোর হাতে দিয়েছিল, তারা কয়েক শ' হবে। তারাও উলিভোর সঙ্গে এগোচ্ছিল। এদের নিয়ে উলিভো যখন স্বর্গের দরজায় পৌছলেন, সেন্ট পিটার তখন ঘৃণাভরে তাদের দিকে তাকালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা সব এখানে কি করতে এসেছ? তোমাদের স্বর্গে প্রবেশের অধিকার নেই। তারপর তিনি উলিভোর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি ভেতরে চলে আসতে পার। সম্প্রতি তুমি যদিও অদ্ভূত আচরণ করছ, তাহলেও তুমি যা কাজ করেছ তাতে স্বর্গের মধ্যে প্রবেশের অধিকার তোমার আছে।

উলিভো উত্তরে তাঁকে বললেন—বোকার মত কথা বলবেন না। আমি কি এই কয়েক শ' আত্মাকে বাইরে রেখে ভেতরে চলে যেতে পারি? ওরা ত আমার; সুতরাং আমার সঙ্গে ওদেরও স্বর্গের ভেতরে যেতে হবে।

সেন্ট পিটার উত্তর দিলেন—অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

উলিভো তখন বললেন—তাহলে আমাদের ভেতরে ঢোকবার আগে আপনি কি প্রভুকে আমার হয়ে একটি কথা বলে আসবেন?

সেন্ট পিটার বললেন—তুমি যদি বল, তাহলে যাব।

উলিভো তাঁকে বললেন—আপনি গিয়ে প্রভুকে বলুন, তিনি যখন আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন, আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি তাঁর বন্ধুরা কারা অথবা তাঁরা সংখ্যায় কত। আমি তাঁদের সকলের জন্যই আমার দরজা খুলে দিয়েছিলাম। প্রভুকে তাই

জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি কি বলতে চান যে একজন সাধারণ গরীব মানুষ তাঁর চেয়ে বেশী অতিথিবৎসল ?

উলিভো জানতেন কি উত্তর আসবে।

তাঁদের সকলকেই স্বর্গে অভ্যর্থনা জানান হল।

বোকার মত প্রার্থিত তিনটি বরের জন্য পাড্রে উলিভো নিজের আত্মাকে ত বটেই, আরও কয়েক শ' আত্মাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

নিষ্ঠুর বিমাতা

অনেকদিন আগে এক গ্রামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। ওই গ্রামেই কিছু দূরে এক বিধবা ভদ্রমহিলা বাস করতেন। তাঁরও একটি মেয়ে ছিল। ওই ভদ্রলোক এই ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করলেন। ভদ্রলোকের মেয়ের নাম ছিল মেরিসিয়া এবং ভদ্রমহিলার মেয়েটির নাম এগনিসিয়া।

এগনিসিয়ার মা মেয়েকে কেবল অলস হতেই শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে হাতে তাঁকে হাঁসের পালকের বিছানা করে দিতেন ; ভাল পোর্সিলিনের পাত্রে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে খাওয়াতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে মেয়েকে সুন্দরী করে তোলবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন ; তার চুলে উটপাখীর পালক দিয়ে সাজাতেন এবং তাকে আয়নায় দেখতে বলতেন—কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে।

তিনি ছিলেন মেরিসিয়ার বিমাতা। মেরিসিয়াকে শোবার জন্য একটি কাঠের তক্তা দেওয়া হয়েছিল। তাকে দেওয়া হত অল্প এবং বাজে খাবার ; কিন্তু তাকে দিয়ে সারাদিন ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ করান হত। নিষ্ঠুর বিমাতা তাকে মাঝে মাঝে মারধোর করতেন এবং নির্দয়ভাবে চিমটি কাটতেন।

মেরিসিয়াকে দেখতে সুন্দর ছিল এবং তাদের সম্প্রদায়ের যুবকরা সকলেই তার দিকে তাকিয়ে থাকত ; কিন্তু তাঁর নিজের মেয়ের দিকে

তারা কেউ তাকিয়েও দেখত না। এই ঈর্ষাপরায়ণা মহিলাটি একদম তা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ভাবতেন মেরিসিয়াকে কি করে সরান যায়। তাহলে নিজের মেয়ের জন্য সব কিছুর অধিকার তিনি পেতে পারেন এবং এগনিসিয়ার বিয়ের জন্য ভাল পাত্রও পাওয়া যেতে পারে।

গ্রামের বাইরে একটি ছোট নদীর ধারে বহুদিন-পরিত্যক্ত একটি কুটির ছিল। সেখানে কেউ বাস করত না। এমন কি কোন আশ্রয়হীন ভবঘুরে দুর্যোগের রাত্রেও সেখানে আশ্রয় নিত না। কারখানার পেছন দিয়ে ঐ কুটিরে যাবার একটি রাস্তা ছিল; কিন্তু সে রাস্তা কেউ ব্যবহার করত না। ঐ রাস্তার দু'ধারে ছিল বিছুটি ও কাঁটা গাছ। গ্রামের লোকরা বলত ওটি ছিল ভুতুড়ে কুটির। বহু বছর আগে কোন এক লোক নাকি ওখানে আত্মহত্যা করেছিল। মাঝ-রাতে ঐ ঘরের ভেতরে আলো জ্বলে উঠত, নিভে যেত, আবার জ্বলে উঠত এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত জ্বলত। ওখানে অদ্ভুত গান শোনা যেত। তাছাড়া নানারকম গোলমাল, আঘাতের শব্দ, খসখস শব্দ, হৈ-হট্টগোল করে খেলা এবং অদ্ভুত সুরে গাওয়া গানও শোনা যেত।

একদিন বিকেলে বিমাতা মেরিসিয়াকে ডেকে তাকে শন্ গাছের তন্তু এবং একটি কাঠি দিলেন। সুতা কাটবার সময় ঐ কাঠি থেকে পেঁজা তুলা বা পশম টানা হয়। ঐগুলি দিয়ে তিনি তাকে ঐ কুটিরে রাত্রি কাটাতে বললেন, আর বলে দিলেন যে ভোরের আগে যেন অনেক সুতা পাকানো হয়ে যায়। তাঁর গোপন ইচ্ছা ছিল যে যদি ওখানে ভূতপ্রেত থাকে, তাহলে ওই হতভাগ্য মেয়েটির কোন সাংঘাতিক ক্ষতি হবে এবং তাহলে তিনি চিরদিনের মত ওর চিন্তা থেকে রেহাই পাবেন।

তাঁর এই আদেশ শুনে মেরিসিয়া অনেকক্ষণ খুব কাঁদল; কিন্তু বিমাতার আদেশ অমান্য করতে সাহস করল না। ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সে ঐ পরিত্যক্ত কুটিরের দিকে রওনা হল এবং যখন সে

ঐ কুটিরে গিয়ে পৌঁছল তখন তার বুক দুরদুর করতে লাগল। গাছপালার খসখস শব্দ এবং নদীর জল পাড়ে আছড়ে পড়ার শব্দে তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মেরিসিয়া কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে কুটিরের দরজা খোলার চেষ্টা করতেই দরজা দুটি যেন আর্তনাদ করে উঠল। ভেতরে ঢুকে সে কাঁপা হাতে একটি আলো জ্বালাল এবং দেখল ঘরটি ফাঁকা, কেউ নেই। কি হয় দেখা যাবে এই ভেবে সে কাজ সুরু করে দিল। মাঝরাত পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর ঝড়ের মত জোরে খানিকটা হাওয়া বয়ে গেল। সেই হাওয়ার শব্দের মধ্যেই জোরে হাততালি দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। একটা কোন গাড়ী আসছে মনে হল, কারণ চাকার ঘড়ঘড়ানি আর সেই সঙ্গে কথা কাটাকাটির শব্দও শোনা গেল।

মেরিসিয়া ঠিক করতে পারল না তার কি করা উচিত—ওখান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত, না যেমনভাবে আছে সেইভাবে থাকা উচিত। সে ভয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁসে দাঁড়াল। পালিয়ে যেতে সে বেশী ভয় পেল। ইতিমধ্যে বাইরের দরজা না খুলেই দু'জন সুন্দর চেহারার যুবক ঘরের ভেতর আবির্ভূত হল। তাদের দু'জনের পোশাক একেবারে একরকম। তাদের পরণে ছিল লম্বা ঝোলা কোট এবং বিশেষ ধরনের রঙীন পাজামা। মাথায় মিলিটারী ধরনের লম্বা টুপি। টুপির নীচে তাদের চোখগুলি আগুন থেকে তুলে আনা জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছিল। বিসদৃশ সুরে বাজনা বাজতে লাগল এবং যুবক দুজন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে নাচতে লাগল। তারা যে গান গাইছিল, তার কথাগুলি ছিল এইরকম ঃ

সবুজ পাজামা,
লাল পাজামা,
নাচ ভাই নাচ।

কিছুক্ষণ নাচার পর তারা দুজনে ওই হতভাগ্য মেয়েটির কাছে গেল এবং এবার তারা গাইল ঃ

সবুজ পাজামা,
লাল পাজামা,
নাচ ভাই নাচ
সুন্দরী সরল মেয়ে
তুমি আমাদের হাত ধর।

ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় মেয়েটি উত্তর দিল—আনন্দের সঙ্গেই আমি নাচতে রাজী ; কিন্তু কি করে আমি নাচব ? তোমরা দেখতেই পাচ্ছ,



তোমাদের সঙ্গে দাঁড়াবার মত আমার কিছুই নেই। ভাল জামা কাপড় না দিয়ে আমার বিমাতা আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তারা জিজ্ঞাসা করল—তোমার কি চাই বল না।

মেরিসিয়া বলল—নিশ্চয়ই বলব। তবে তোমরা নিজেরাই ত দেখতে পাচ্ছ। তোমরা কি মনে কর আমি খালি পায়ে তোমাদের সঙ্গে নাচতে পারি? তোমরা আমাকে পাতলা সোল এবং হাল্কা হিলের একজোড়া লাল জুতো এনে দাও।

তারা তখনই তাকে সেইরকম জুতো এনে দিল। তারপরে সে চাইল মোজা, এমব্রয়ডারী করা ব্লাউজ, পাঁচটি সায়া ও স্কার্ট এবং হাতকাটা ঢিলে জামা (কেপ্)। সে গলায় পরার জন্য পলার মালা, একটি ভাল হাতপাখা এবং একটি সিল্কের রুমাল চাইল। একটি আয়নাও সে চাইল, যাতে ঐসব পরে তাকে কি রকম দেখায় সে দেখতে পারে। সবশেষে সে বলল—টাকা সমেত একটি ব্যাগ আমাকে দাও, আমি কি শুধু শুধুই তোমাদের সঙ্গে নাচব।

তার কথামত আবার তারা উড়ে গিয়ে একটি সোনার মুদ্রা ভর্তি সুন্দর থলি এনে দিল। একের পর এক সে যা যা চেয়েছিল সব তারা এনে দিল এবং যতবারই তারা যাওয়া-আসা করল ঐ গানটি তাদের মুখে লেগেই ছিল। অনেকবার যাওয়া-আসা করে তারা বিরক্ত হল এবং শেষে বলল—এবার তৈরী হয়ে নাও। আমাদের সঙ্গে নাচ সুরু কর।

মেরিসিয়া বলল—আমি গা-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার না হয়ে কি করে তোমাদের সঙ্গে নাচব? এই কথা বলে সে একটি পুরানো চালুনি তাদের হাতে দিয়ে জল এনে দিতে বলল। তারা ঐ চালুনিতে জল ভর্তি করে আনতে গেল। কিন্তু দেখল যে যতটা জল ভর্তি করছে, প্রায় সবটাই পড়ে যাচ্ছে। তারা অনেকবার ঐতে করেই জল আনবার চেষ্টা করল; কিন্তু তার হাতমুখ ধোওয়া হল না। ইতিমধ্যে কাক ডেকে উঠল; ভোর হয়ে এল। তাদের সময়ও ফুরিয়ে গেল। তাদের নাচা আর হল না। রাগে গজগজ করতে করতে তারা চালুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তাকে বলল—ঠিক

আছে, তুমি খুব চালাক ত। আর একবার তুমি এখানে এস, তোমাকে আমরা দেখে নেব। এই বলে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশেষে দুর্ভাগা মেয়েটি দম ফেলার সময় পেল। সারা রাত্রির ঘটনাগুলিতে ভীত, বিস্মিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে সে বিশ্রাম নেবার জন্য শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

তার বিমাতা খুব ভোরেই উঠে পড়েছিলেন। মনে মনে তিনি বেশ খুশি বোধ করছিলেন এই ভেবে যে এতক্ষণে তিনি ঐ মেয়েটির ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হলেন। তিনি শন্ গাছের তন্তুগুলি এবং তন্তু থেকে সুতা টানবার কাঠটি ফিরিয়ে আনবার জন্য ঐ কুটিরের দিকে রওনা হলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে মেরিসিয়া মারা যায়নি ; সে ঘুমোচ্ছে। অপূর্ব সাজে সে সজ্জিত এবং তাকে আরও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। তার চারধারে বেশ মূল্যবান সব জিনিষ ছড়ান এবং তার কোন ক্ষতিই হয়নি।

মেরিসিয়াকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তিনি একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন। উত্তরে গতরাত্রের সব ঘটনা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর নিজের মেয়ে না পেয়ে মেরিসিয়া এতসব সুন্দর সুন্দর দামী জিনিসপত্র পেয়েছে বলে তিনি আরও বেশি ঈর্ষান্বিত হলেন। বাড়ী ফিরে তিনি মেয়েকে সব ব্যাপার জানিয়ে বল্লেন—আজ রাত্রে তুমি ওই কুটিরে যাবে। তুমি তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালভাবে সাজতে পারবে আর তুমিও একই ভাল ভাল উপহার পাবে।

মার কথামত সন্ধ্যাবেলা এগনিসিয়া ঐ পরিত্যক্ত কুটিরে গিয়ে ভেতরে বসে সুতা কাটতে লাগল। আগের রাত্তিরের মতই সব ঘটনা ঘটতে লাগল। মাঝরাতে সেই দুইভাই এল। একজনের পরণে ছিল সবুজ পাজামা, আর একজন পরেছিল লাল পাজামা। তাদের মাথায় মিলিটারী ধরনের টুপি পরা ছিল। বাজনা আরম্ভ হল এবং তারা আগের রাত্রের মত গান গাইতে আরম্ভ করল।

এগনিসিয়া বোকার মত তাদের কাছে একসঙ্গে সব জিনিস চেয়ে

বসল—জুতা, মোজা, ব্লাউজ, সায়া, স্কার্ট, রুমাল, পাখা, আয়না এবং অন্যান্য জিনিষ। এতে অবশ্য তার ঠিক দোষ ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সে অমন বোকার মত কাজ করল। শেষে সে তাদের বলল এবার আমাকে জল এনে দাও, আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিই। এই বলে সে তাদের হাতে পুরানো একটি দুধের পাত্র দিল। পাত্রটির তলায় ফুটো করা ছিল। ভাইরা দু'জন আঙ্গুল দিয়ে সেই ফুটো চেপে ধরে তাতে জল ভর্তি করে এনে তাকে বলল—ও সুন্দরী কুমারী! তাড়াতাড়ি তুমি হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে সুন্দর পোষাকগুলি পরে ফেল। দেরী কোরনা। সময় চলে যাচ্ছে।

এই কথা শুনে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পোষাক পরে একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিল। তারপর নাচবার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়াল।

তখনই ওই দুই ভাই তাকে ধরে সমানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে তার মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হল। তারা তবু ওকে ধরে সমানে নেচেই চলল। তার মনে হল হাতদুটি বোধহয় দেহ থেকে ছিঁড়ে যাবে আর পা দুটোও উড়ে যাবে। প্রত্যেকবার ঘোরার সময় সে কেঁদে উঠছিল এবং তাদের থামবার জন্য অনুনয় করছিল—যথেষ্ট হয়েছে। এবার দয়া করে থাম। আমাকে একটু দম নিতে দাও।

তারা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে আরও জোরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচেই চলল। শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে গেল এবং কাক ডেকে উঠল। তাদের সময় ফুরিয়ে গেল। দুই ভাইয়ের একজন এগনিসিয়ার মুণ্ডটি টেনে ছিঁড়ে জানালার ফাঁকে রেখে দিল। আর এক ভাই মুণ্ড ছাড়া দেহটি ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিল। যেসব জিনিষ তারা তাকে দিয়েছিল, সে সব তারা ফিরিয়ে নিল এবং যাবার সময় তার আত্মাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে নিল। তারা যখন বনের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন সারা বনই কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই তার মা বিছানা ছেড়ে উঠে

তাড়াতাড়ি মেয়েকে দেখবার জন্য রওনা হলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর মেয়ে তার সপত্নী কন্যা মেরিসিয়ার দ্বিগুণ সব পোশাক ও সোনাদানা পেয়েছে। ঐ কুটিরে পৌঁছবার আগে দূর থেকেই তিনি দেখতে পেলেন যে তার মেয়ের দাঁত-বার-করা মুখটি জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে।

আনন্দে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—ও আমার প্রিয়তমা কন্যা! তুমি জানলা দিয়ে আমার আসার পথের দিকে চেয়ে আছ। তোমার গলায় রয়েছে মালা আর মুখে রয়েছে আনন্দের হাসি।

ঐ কুটিরের পাশেই একটি বড় গাছ ছিল। তার একটি উঁচু ডালে বসা পাখীটি গান গেয়ে তার উত্তর দিল ঃ

মুণ্ডটি জানালায়, পা ছুটি নদীতে।

নিষ্ঠুর বিমাতা ব্যাপারটি বুঝলেন। তিনি নিজের দোষে কি কাণ্ড ঘটিয়েছেন নিজেই দেখলেন। তাঁর নির্দোষ সপত্নীকন্যার হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তিনি এমন কাজ করলেন যাতে তাঁর নিজের কন্যা পেল অসীম কষ্ট ও পীড়ন এবং শেষে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

প্রতিশোধ

বহুদিন আগের কথা। সুইজারল্যাণ্ডে কোন রাজা ছিলেন না। একজন রাজ্যপাল দেশ শাসন করতেন। তাঁর নাম ছিল—গেসলার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক। তাঁর ব্যবহার ছিল খুব খারাপ এবং তাঁর শাসন ছিল খুব কড়া। সকলেই তাঁকে খুব ভয় করত। ওই দেশের লোকেরা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অনেকেই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করত কি করে এই অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা যায়।

ঐ দেশে উইলিয়াম টেল বলে একজন লোক বাস করত। এই লোকটি ছিল খুব ভাল। তার গায়ে অসীম শক্তি ছিল। তাছাড়া টেল খুব ভাল তীর ধনুক ছুঁড়তে পারত এবং নৌকোয় দাঁড় বাইতে পারত। টেল-এর বৌ-এর নাম ছিল হেডুইগ। একদিন টেল জামা-কাপড় পরে বাইরে বেরোবে এমন সময় তার বৌ হেডুইগ এসে তাকে বেরোতে বারণ করল। টেল অবশ্য কোন কথা না শুনে বৌকে বুঝিয়ে তার ছেলে ওয়াল্টারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেক বন জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে তারা এগোতে লাগল। চারদিকে বরফ পড়ে পাহাড়ের চূড়াগুলি কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওয়াল্টার যেতে যেতে বাবাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। অনেক দূর চলে যাওয়ার পর এক জায়গায় তারা দেখল যে একটি খুঁটি পোঁতা রয়েছে, আর সেই খুঁটির মাথায় একটি টুপি। তারা দেখল যে যেসব লোক ওই খুঁটির পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তারা মাথা থেকে নিজেদের টুপি

খুলে একটু হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে তারপর আবার মাথায় টুপি দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐখান দিয়ে যাবার সময় ওয়াল্টার তার বাবাকে বলল যে সকলেই ঐ খুঁটির কাছে মাথার টুপি খুলে তারপর আবার এগোচ্ছে। তার বাবা বলল যে খুঁটির মাথায় একটি টুপি ঝুলছে, তার কাছে আমরা মাথার টুপি খুলে নাড়িয়ে তারপর এগোব কেন? এই বলে সে ছেলের হাত ধরে এগিয়ে গেল।

ঐ যে খুঁটি ও টুপি ছিল—ওগুলি ওখানে রাখা হয়েছিল দেশের রাজ্যপাল গেসলারের নির্দেশ অনুযায়ী। গেসলার হুকুম দিয়েছিলেন যে সব লোককে ঐ খুঁটির কাছ দিয়ে যাবার সময় নিজের নিজের মাথার টুপি খুলে মাথা নীচু করে তারপর যেতে হবে। ঐ খুঁটির কাছে তিনি কয়েকজন সৈন্যকেও রেখেছিলেন। তারা লক্ষ্য রাখত যে সব লোক ঠিকমত ঐখানে মাথার টুপি খুলে মাথা নীচু করে যাচ্ছে কিনা।

টেল আর ওয়াল্টার খুঁটির কাছে মাথার টুপি না খুলে এগিয়ে যেতেই গেসলারের সৈন্যরা এসে টেলকে ধরল। তারা বলল যে টেলকে তারা বন্দী করে জেলে পুরে রাখবে; কারণ টেল ঐ খুঁটির কাছ দিয়ে যাবার সময় মাথার টুপি না খুলে এগিয়ে চলে যাচ্ছিল এবং তাতে টেল দেশের রাজ্যপাল গেসলারকে অপমান করেছে। সৈন্যরা টেলকে ধরেছে এবং তাকে জেলে পুরে দেবে বলছে—এই দেখে ও শুনে টেল-এর ছেলে ওয়াল্টার ত হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল; আর তার সেই চেঁচামেচি ও কান্না শুনে রাস্তায় অনেক লোক জমে গেল। তারা সকলে মিলে সৈন্যদের অনুরোধ করল টেলকে ছেড়ে দেবার জন্য। সৈন্যরা কিছুতেই টেলকে ছাড়বে না। সৈন্যদের সঙ্গে রাস্তার লোকদের কথা কাটাকাটি এবং ওয়াল্টারের কান্না মিলিয়ে রাস্তায় বেশ গণ্ডগোল সুরু হয়ে গেল। সেই গোলমাল ও কান্নাকাটি শুনে রাজ্যপাল গেসলার নিজে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপার শুনলেন। গেসলার আসতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। সৈন্যরা

টেলকে ধরে গেসলারের সামনে এনে নালিশ করল যে টেল তাঁর টুপিকে অপমান করেছে। তাই টেল-এর শাস্তি হওয়া উচিত।

গেসলার শুনেছিলেন যে টেল খুব শক্তিমান এবং সে খুব ভাল তীর ছুঁড়তে পারে। গেসলারের কি খেয়াল হল, তিনি টেলকে বললেন—দেখ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমার ছেলেকে মাথায় একটা আপেল দিয়ে ঐ দূরে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে আর তোমাকে তীর ছুঁড়ে ঐ আপেলটিকে কাটতে হবে।

এই কথা শুনে টেল খুব ঘাবড়ে গেল এবং সে গেসলারকে জানাল যে সে ও কাজ করতে পারবে না। গেসলার তখন টেলকে ধমক দিয়ে বলল যে সে যদি গেসলারের কথামত কাজ না করে তাহলে টেলকে এবং তার ছেলেকে দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে। টেল-এর ছেলে ওয়াল্টার তখন বাবাকে বলল—আমি আপেল মাথায় নিয়ে দাঁড়াচ্ছি ; আমার একটুও ভয় করবে না। আর আমি জানি যে তুমি তীর ছুঁড়লে তাতে আপেলটি ঠিক কেটে যাবে।

ছেলের কথায় একটু সাহস পেয়ে এবং গেসলারের কথায় ভয় পেয়ে টেল তখন রাজী হল। ওয়াল্টার আপেল মাথায় করে গাছের ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়াল এবং টেল তীর ছোঁড়ায় আপেলটি ঠিক কেটে গেল। গেসলার টেলের সাহসিকতা দেখে ও তীর ছোঁড়ার কায়দা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। টেল প্রথম তীরটি ছুঁড়ে দিয়েই দ্বিতীয় আর একটি তীর ধনুকে লাগিয়েছিল। গেসলার সেটি দেখে একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি ভাবলেন, এ তীরটা আবার কোথায় ছুঁড়বে ?

গেসলার টেলকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ তীরটা কি হবে ?

টেল তাকে সহজভাবে উত্তর দিল যে সে ঠিক করেছিল যে যদি প্রথম তীরটি তার ছেলের গায়ে লাগে, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় তীর দিয়ে গেসলারকে মারবে। এই কথা শুনে গেসলার তার লোকদের হুকুম দিলেন টেলকে বেঁধে নৌকোয় তুলতে। তিনি নিজেও নৌকোয় উঠলেন। টেলকে তিনি সারা জীবন বন্দী করে

রাখবেন বলে নিজে সঙ্গে করে তাকে লেকের অপর পারে বন্দীশালায় নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। টেলের তীর ধনুক গেসলার নিজে ব্যবহার করবেন এই ভেবে সেগুলিকেও নৌকোয় নিয়ে নিলেন।

নৌকো ওপারের দিকে কিছুদূর এগোতেই হঠাৎ খুব ঝড় উঠল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। ঝড় ওঠায় লেকের জল তোলপাড় হতে লাগল এবং ওদের নৌকোও জলের ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠানামা করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যে নৌকো এই বুঝি সবসুদ্ধ ডুবল। সেই সময় নৌকোর একজন লোক গেসলারকে বলল যে টেল খুব ভাল নৌকার দাঁড় বাইতে পারে এবং ঝড় ঝাপটার সময় বহু লোককে সে নিরাপদে ওপারে নিয়ে গেছে। এই কথা শুনে গেসলার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন একথা সত্যি কি না, আর সে নৌকোর দাঁড় ধরে তাঁদের নিরাপদে ওপারে নিয়ে যেতে পারবে কি না?

টেল উত্তর দিল যে ভগবান সহায় হলে সে ঠিক পারবে। তখন গেসলার তাঁর লোকদের বললেন টেল-এর বাঁধন খুলে দিতে। লোকরা তার বাঁধন খুলে দিল।

লেকের জলে তখনও তোলপাড় হচ্ছে। খুব মেঘ ডাকছে। টেল তখন নৌকোর দাঁড় ধরল। নৌকো প্রায় ডাঙ্গার কাছে এসে গেল। সুযোগ বুঝে টেল নৌকো থেকে তার তীর ধনুক নিয়ে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়ল। নৌকোটা জলে একটু ঘুরপাক খেয়ে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। টেল ডাঙ্গায় নেমেই পাহাড়ের একটু ওপরে উঠে একটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ওদিকে গেসলার ও তার লোকজনরাও ডাঙ্গায় উঠে এগোতে আরম্ভ করল। টেল ঝোপের ভেতর থেকে দেখল যে আগে গেসলার ও তারপর তার অন্য লোকজনরা আসছে। টেল ঐ দেখে তীর ধনুক ঠিক করে দাঁড়াল। গেসলার যখন ঐ ঝোপের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন ঝোপের ভেতর থেকে টেল তীর ছুঁড়ল। সেই তীর বিঁধে গেসলার মারা গেলেন।